দাম : বারো টাকা

শুধু হিন্দু মন্দিরের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কেন?
— পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস এখন অপ্রাসঙ্গিক
— পৃঃ ১৭

৭৪ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ৭ মার্চ, ২০২২।। ২২ ফাল্গুন - ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

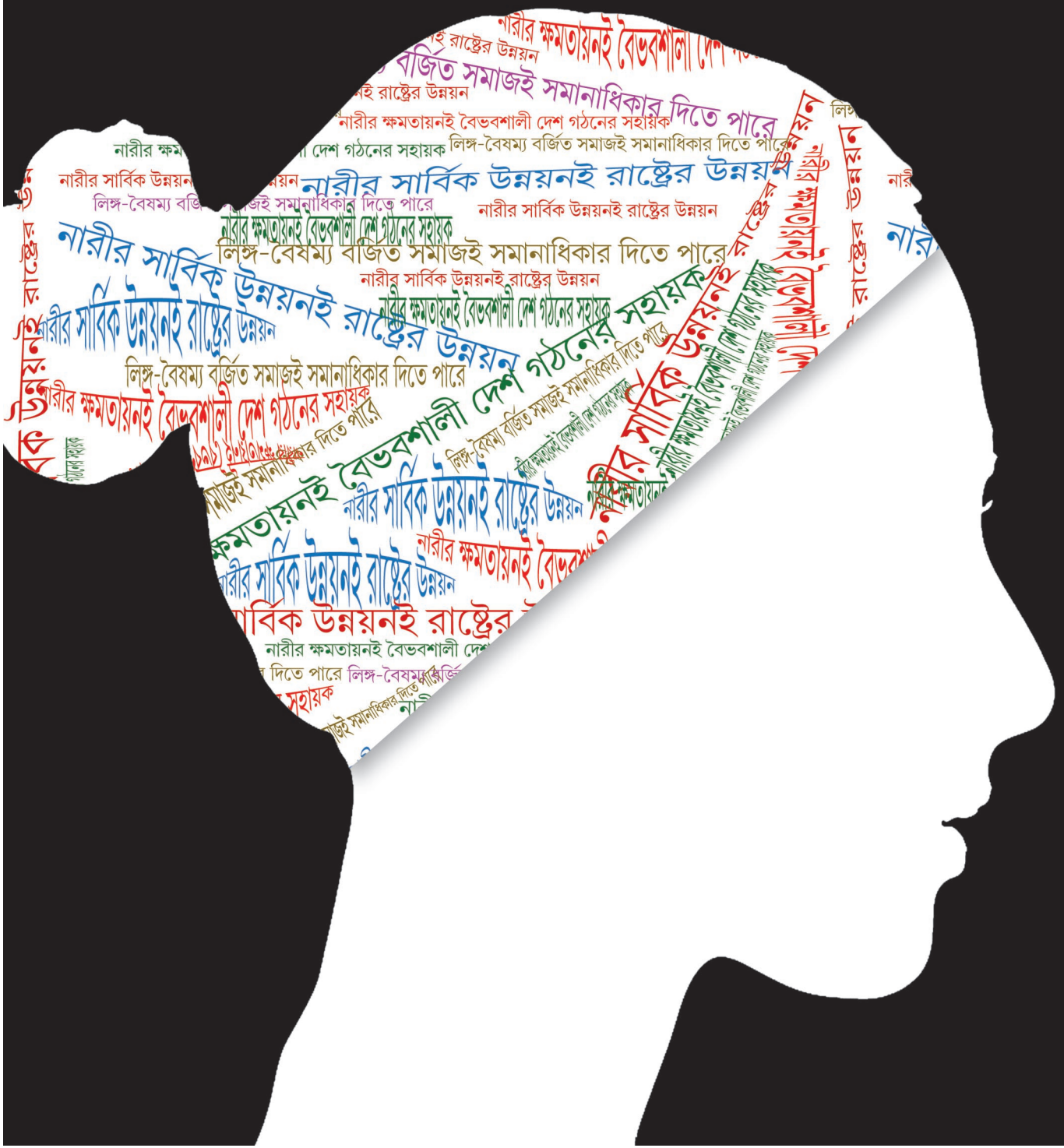

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ২২ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৭ মার্চ - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

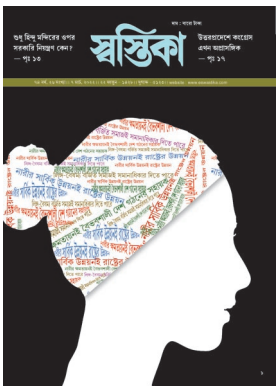

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

রাজীব কুমার থেকে আনিস খান, মমতার 'সিবিআই অ্যালার্জি' কি বৈধ ? □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

এক জামাতেই চল্লিশ ভোট □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

করোনার মধ্যেই যুদ্ধের ছোবল □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৮

ওয়েসিদের শিক্ষা দিতে হর্ষের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক □ রাজু সরখেল □ ১০

মাঘমাসের পূর্ণিমা তিথিতে □ চন্দ্রভানু ঘোষাল □ ১১

শুধু হিন্দু মন্দিরের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কেন ?

□ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৩

আসল ফ্যাসিবাদী কারা, চিনে নিন

□ মহাকালেশ্বর উপাধ্যায় □ ১৫

উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস এখন অপ্রাসঙ্গিক

□ রঞ্জন কুমার দে □ ১৭

নারীর সার্বিক উন্নয়নেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন □ শ্রীনিখল □ ২৩

সাক্ষাৎকার : সমাজের সব মেয়ের সার্বিক উন্নতি চাই : চন্দনা বাউরি □ ২৬

ভারতের মেয়েদের দিন বদলাতে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াস

□ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় □ ২৭

সামতাবেড়ে শরৎভিটের সঙ্গে মদনগোপাল

□ দেবাশিস চৌধুরী □ ৩১

ভারতবর্ষের যোগ এক অমূল্য দর্শন □ প্রোজ্জ্বল মণ্ডল □ ৩৩

ভারতের পরিবার ব্যবস্থাই সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজগঠনের চাবিকাঠি □ অসিত চক্রবর্তী □ ৩৫

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক সরসঙ্ঘচালক রামকৃষ্ণ মিশনের এক সঙ্ঘাধ্যক্ষের নির্মিত

□ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৬

স্বনির্ভর ভারত গড়তে মোদী সরকারের উন্নয়নমুখী গতিশীল আর্থিক বাজেট □ আনন্দ মোহন দাস □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ □ রঙ্গম : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ স্মরণে : ৪৭ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ □ রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৪ মার্চ
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৪ মার্চ
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মন রাঙানিয়া

এসে গেল দোল। এই বিশেষ দিনটিতে দেশের মনের রং ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে। সেই রঙে এ দেশের বেশিরভাগ মানুষ যে-যার নিজের মনটি রাঙিয়ে নেন। এই রং খেলায় ধনী-দরিদ্র নেই, উচ্চ-নীচ নেই— এমনকী শিক্ষিত-অশিক্ষিতও নেই। নানান ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্ণ মনটি নিয়ে সবাই বাইরে আসেন এবং রাঙিয়ে নিয়ে আবার ফিরে যান। প্রতি বছরের মতো এবারও স্বস্তিকার দোল সংখ্যা প্রকাশিত হবে সাহিত্য সংখ্যা হিসেবে। থাকবে নানা স্বাদের চারটি গল্প এবং দুটি প্রবন্ধ। লিখবেন, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, নিখিল চিত্রকর, অনামিকা দে, সিদ্ধার্থ সিংহ এবং সন্দীপ চক্রবর্তী।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ আবেদন

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পাঠানো সত্ত্বেও ডাকযোগে বহু গ্রাহকই স্বস্তিকা ঠিকমতো পাচ্ছেন না— এরকম অভিযোগ আমরা হামেশাই পাচ্ছি। এবিষয়ে ডাকবিভাগে যোগাযোগ করেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই, আমরা রেজিস্ট্রি পোস্টের মাধ্যমে স্বস্তিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। যাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ বহন করতে আগ্রহী তাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ কার্যালয়ে জমা দিলে আমরা তাঁদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকের মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

রেজিস্ট্রি খরচ—

প্রতি সপ্তাহে ২২.০০ টাকা।

এক মাসের পত্রিকা একসঙ্গে পাঠালে ৩০.০০ টাকা।

(বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছাড়াও এই রেজিস্ট্রি খরচ অতিরিক্ত দিতে হবে।)

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রতিটি দিন হউক নারী দিবস

বিগত বেশ কয়েক বৎসর হইতে কোনো কোনো বিশেষ দিন ঘটা করিয়া পালন করিবার প্রবণতা বাড়িয়াছে। সেই একটি নির্দিষ্ট দিনেই বিশেষ একটি বিষয়ে মাতামাতি করিয়া আমরা মনে করিতেছি যে, আমরা সমস্ত দায়িত্ব পালন করিয়া ফেলিলাম এবং আমরা যথার্থ মানুষ হইয়া উঠিলাম। বিশেষ একটি দিন ঘটা করিয়া পালন করিবার প্রয়োজন পড়িবার অর্থই হইল সংশ্লিষ্ট বিষয়টির মর্যাদা আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। ঘোষিত দিনটি পালন করিয়া মনে করিতেছি যে, আমরা কিছুটা হইলেও পাপের ভার লাঘব করিলাম। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, মর্যাদা প্রদর্শন অথবা ভালো কর্মের প্রংশসা বা স্বীকৃতি প্রদান তো চিরকালীন বিষয়। বৎসরের প্রতিটি দিন তাহা জীবনের অঙ্গ হইয়া থাকিবার কথা। ৮ মার্চ দিনটিও সারা বিশ্বে ঘটা করিয়া পালিত হইতেছে। চিন্তা করিবার বিষয় হইল, ৩৬৫ দিনের মধ্যে ওই একটি দিনই কেন বিশ্বব্যাপী নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা তাহাদের ভালো কর্মের প্রশংসার জন্য নির্দিষ্ট হইল? ভারতবর্ষের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এইরকম কোনো বিশেষ দিন ঘটা করিয়া পালন করিবার রীতি কোনোদিনই ছিল না। এই দেশের মানুষ তাহার দিন শুরু করিতেন 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। সর্বভূতে ভারতবর্ষের মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। নারী জাতিকে জগৎ প্রসবিতা মনে করিয়া দেবী অথবা মাতৃ সম্বোধন করিবার চল রহিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বার বার সমাজকে মনে করাইয়া দিয়াছেন যেইখানে নারীজাতির পূজা করা হয় সেইখানে দেবতারা বাস করেন। আর যেইখানে তাহাদের অসম্মান করা হয় সেইখানের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম ব্যর্থ হয়। পশ্চিমের প্রচারের মোহে পড়িয়া ভারতবর্ষের নারীবাদীরাও নারী স্বাধীনতার বিষয়ে সোচ্চার হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের জানিয়া রাখা ভালো যে, প্রাচীন ভারতে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ কোনোদিনই ছিল না। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে ইহার ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি রহিয়াছে। এই উদ্ধৃতিগুলিই প্রমাণ করিতেছে ভারতীয় সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই নারীর অবস্থান সম্মানজনক ও গৌরবময় স্থানে রহিয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তালিবানি মানসিকতাসম্পন্ন হিন্দুদ্বেষী বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থী বিচারধারার তথাকথিত ঐতিহাসিকরা হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলির বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীজাতির শোষণ ও অপমানের এক মনগড়া ও তথ্যহীন কথা প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির গৌরবকে কালিমালিপ্ত করিবার ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছেন। ইহা সত্য যে, ভারতবর্ষের মধ্যযুগে বর্বর ইসলামি আক্রমণকারীদের শাসনকালে নারীজাতির সুরক্ষার কথা মাথায় রাখিয়া সমাজে তাহাদের প্রতি কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছিল। সেই বিধিনিষেধ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবার কারণে তাহা সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়া বসিয়াছিল। পাঠান মুঘলের যুগ সমাপ্ত হইতেই সমাজ সংস্কারকগণ সেই বিধিনিষেধের বেড়াজাল ভাঙিয়া ফেলিবার অক্লান্ত প্রয়াস করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহারা সফল হইয়াছেন। তাহারই ফলশ্রুতিতে সেই অচলায়তনের বেড়া উল্লঙ্ঘন করিয়া সাবিত্রীবাঈ ফুলে, অহল্যাবাঈ হোলকর, রানি দুর্গাবতী, রানি রাসমণি, মা সারদা, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মহিলা সদস্যরা শিক্ষা,সাহিত্য, ধর্ম ও শাসনকার্যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। ধীরে ধীরে নারীসমাজ স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হইতে শুরু করিয়াছে। বর্তমানে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পদচারণা করিতেছেন। দেশের সরকারও নারীজাতির ক্ষমতায়নের জন্য নানা পদক্ষেপ লইয়াছে।

ইহার পরও একটি কথা ভাবিবার রহিয়াছে। তাহা হইল বিশ্ব জুড়িয়া নারী মুক্তির কথা বলিয়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘটা করিয়া পালন করিবার পরও কি নারীরা সমানাধিকার পাইয়াছেন? ইহার উত্তর নিশ্চিতভাবেই নেতিবাচক। ইহার কারণ হইল বিশ্ব জুড়িয়া রাষ্ট্রীয় স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের বহুবিধ চেষ্টা চলিলেও নারীরা ইহা গ্রহণ করিবার জন্য মানসিকস্তরে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হন নাই। সরকারের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতিকেও স্বমহিমায় বিরাজিত হইবার মন প্রস্তুত করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন আয়োজিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দেখিয়া মনে হইতেছে দিনটি উদ্‌যাপিত হইতেছে শুধুমাত্র পুরুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্যই। পুরুষরাই বোধ হয় নারীজাতির অগ্রগতির সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাই বুঝি নারী দিবসে তাহাদের মুখে ধ্বনিত হইতেছে— 'নারী দিবস দিচ্ছে ডাক, পুরুষতন্ত্র নিপাত যাক।' নারী সমাজকে বুঝিতে হইবে, নারী-পুরুষে দ্বন্দ্ব নয়, পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতেই সফলতা লাভ করিতে হইবে। পুরুষ সমাজকেও সুদীর্ঘকালের লালিত রক্ষণশীল মনোভাব ত্যাগ করিয়া নারীকে তাহার যোগ্য মর্যাদা প্রদান করিতে হইবে। তাহাদের মানুষ হিসাবে ভাবিতে হইবে। নারীর উত্থান মানে শুধু চাওয়া-পাওয়া নয়, যোগ্যতার অর্জন। যোগ্যতার অর্জনেই নারীজাতি আবার স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হইবে। তখন আর আলাদা করিয়া নারী দিবস পালন করিবার কোনো প্রায়োজনই পড়িবে না।

সুভাষিতম্

স্বভাবং নৈব মুঞ্চন্তি সন্তঃ সংসর্গতোঽসতাম্।
ন ত্যজন্তি রূতং মঞ্জু কাক-সম্পর্কতঃ পিকাঃ।।

সজ্জন পুরুষ দুর্জনদের মধ্যে থাকলেও নিজের সহজ সরল স্বভাব পরিত্যাগ করেন না। যে রকম কাকের সংস্পর্শে থেকেও কোকিল তার মধুর স্বর কখনোও ত্যাগ করে না।

রাজীব কুমার থেকে আনিস খান, মমতার ‘সিবিআই অ্যালার্জি’ কি বৈধ?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ। অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্।’ আচার্য চাণক্যের সূক্তিরত্নাবলী আজও প্রাসঙ্গিক। তৃণমূলের এক প্রভাবশালী নেতার কথায় ‘আমি হলে (অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হলে) আনিস খানের মৃত্যু নিয়ে সিবিআই তদন্ত মেনে নিতাম যাতে বিরোধীরা ঠুঁটো হয়ে যায়। তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই মানুষ তা ভুলে যেত।’

২০১৪-র মে মাসের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সিবিআই অ্যালার্জিতে’ ভুগছেন। ওই সময় সারদা চিট ফান্ড তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৩-র মাঝামাঝি সারদা চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি মমতা রাজ্যের মাথায় ভেঙে পড়ে। বাম-কংগ্রেস আমলে বিরোধী নেত্রী থাকার সময় কথায় কথায় সিবিআই তদন্ত চাইতেন মমতা। ২০১১-র পর তা ভুলে যান তিনি। বামফ্রন্টের পুলিশ রাতারাতি তাঁর আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। সেই থেকে সিবিআই তাঁর শত্রু। ২০১৮-তে সিবিআই তদন্তের ‘সাধারণ অনুমতি’ বা জেনারেল কনসেন্ট বাতিল করে দেন মমতা। বিজেপি বিরোধী সাত রাজ্য ওই অনুমতি তুলে নিয়েছে। ১৯৮৯ সালে সিপিএম চালিত বামফ্রন্ট সরকার সিবিআইকে ওই অনুমতি দিয়েছিল। সবার অভিযোগ সিবিআই রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার হয়। সিবিআইকে গুরুত্ব দিলে রাজ্য পুলিশের মনোবল ভেঙে যেতে পারে সে ব্যাপারে সদাসতর্ক মমতা। ২০১৮-তে এক ফেব্রুয়ারির রাতে কলকাতা নগরপাল রাজীব কুমারকে ধরতে আসে সিবিআই। আজ পর্যন্ত অধরা কুমার। রাজ্য প্রশাসনে তিনি বহাল তবিয়তে রয়েছেন। গ্রেপ্তারের বহু চেষ্টা করেও সিবিআই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

> “সিবিআই নিয়ে মমতা ব্যানার্জির এত অ্যালার্জি কেন? কবে এই অ্যালার্জি সারবে?”

মনে হয় রণে ভঙ্গ দিয়েছে সিবিআই বা দেওয়ানো হয়েছে। কুমারকে বাঁচাতে সেই রাতে মমতার অতি সক্রিয়তা সবার জানা। তিনি প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলেছিলেন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। কুমারের জন্য এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন মমতা।

আনিসের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেনি। আলাদাভাবে তাঁর পরিবারের আস্থা অর্জনের কোনো চেষ্টাও করেননি মমতা। ‘অবয়বহীন’ আর ‘অপ্রাসঙ্গিক’ কিছু প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিষয়টি সামলানোর চেষ্টা করেছেন আর রহস্যঘন দুটি মন্তব্য করেছেন ‘আনিসের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল’ আর ‘এই ধরনের কাজ কেউ ইচ্ছা করে ঘটায় না’। অর্থাৎ আনিস তৃণমূল দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আর তাঁর মৃত্যু অনিচ্ছাকৃত বা আচমকা ঘটেছে। বিষয়টি গোলমেলে। তাঁর পরিবার সিবিআই তদন্ত দাবি করেছে। জানিয়েছে আনিস আইএফএফ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আনিসের মৃত্যু ঘিরে দল, প্রশাসন, আর পুলিশ এককাট্টা হয়ে গিয়েছে। নগরপালকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীর দায় থাকতে পারে। কিন্তু কোনো এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে মুখ্যমন্ত্রীর এই অতি সক্রিয়তা নিশ্চিতভাবেই আমাকে অবাক করেছে। ২০০৪ সালে গুজরাটে ইসরত জাহান এনকাউন্টার কাণ্ডে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ ওঠে সেই সময়ের রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে। আনিস যেহেতু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা একটু বেশি সক্রিয় বলে অনেকের ধারণা। মমতা জানেন ২০০৭ সালে রিজওয়ানুর মৃত্যুকাণ্ডে কীভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার। ২০১১-র নির্বাচনে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের জমি জটের পাশাপাশি রিজওয়ানুর কাণ্ডেও অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল সিপিএম। মমতা দম্ভ করে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চোরকে ধরতে পারেনি সিবিআই। অর্থাৎ সিবিআইয়ের দক্ষতা নিয়ে তাঁর সন্দেহ রয়েছে। সারদা মামলায় ১০০-র ওপর চার্জশিট দিয়েছে সিবিআই। কিন্তু কোনো আঁচই পড়েনি মমতা বা তাঁর প্রশাসনের উপর। ডঙ্কা বাজিয়ে ২০১৬ আর ২০২১-এর রাজ্য নির্বাচন তিনি বিপুল ভোটে জিতেছেন।

১৯৯৩ সালে চটকল শ্রমিক ভিখারি পাসোয়ানের নিরুদ্দেশ ঘটনার পর থেকে থেকে রাজ্যে অন্তত ৭টি বড়ো তদন্ত সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে সিবিআই, যার মধ্যে রয়েছে ২০০৪ সালে বিশ্বকবির নোবেল পুরস্কার চুরি। তাছাড়া ১৯৯৪-এ ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা রমজান আলি খুন, বানতলায় অনিতা দেওয়ানকে ধর্ষণ ও খুন, ডিসি বন্দর বিনোদ মেহতা হত্যায় জড়িত পুলিশ লকআপে ইদ্রিশ আলির রহস্যজনক মৃত্যু, ১৯৯৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মনীষা মুখার্জির নিখোঁজ রহস্য আর ২০০৩ সালে ছোটো আঙারিয়া গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকদের পুড়িয়ে হত্যার মতো ঘটনা। তাহলে সিবিআই নিয়ে মমতার এত অ্যালার্জি কেন? কবে এই অ্যালার্জি সারবে? □

এক জামাতেই চল্লিশ ভোট

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো
নবান্ন, কালীঘাট

দিদি,

আপনার দুটো পরিচয়। দুটো সম্বোধন এবং দুটো ঠিকানাতেই পাঠাচ্ছি এবারের চিঠি। পুরভোটে বিপুল জয়ের জন্য অভিনন্দন দিদিভাই। আপনি দেখিয়ে দিলেন কীভাবে ভোটে জেতা যায়। রাস্তাঘাটের খারাপ অবস্থা, পানীয় জলের সমস্যা— সব থাকা সত্ত্বেও পুরনির্বাচনে এমন বিপুল জয় যে সম্ভব তা আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন। আপনার মতো ভ্রাতৃকূল পাওয়াটা সত্যিই ভাগ্যের। তারা কোনও পরিষেবা ছাড়াই আপনাকে জয়ের আনন্দ দিতে পেরেছে। আর সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে তোমরা ভোট দাও আর না দাও আমরা ঠিক ভোট পেয়ে যাব। সুতরাং, পরিষেবা চেয়ো না। বিরোধী দল টিকতে পারবে না আমরাই সব ভোট পাব। আমরাই সেরা।

দিদি একটা মাত্র উদাহরণ দেব। একটা। কীভাবে ভোট হয়েছে তা আপনার এক ভাইয়ের জবানেই শুনুন। কোনও রাখঢাক না রেখেই তিনি সরাসরিই দাবি করেছেন, রাজ্য পুলিশের পরিচালনায় পুরভোট হওয়ায় তাঁর সুবিধা হয়েছে। এক জামাতেই ৪০টি ভোট দিয়েছেন! তিনি একা। আগে কিছু রাখঢাক থাকলেও এখন আর সেটা থাকবে না। তিনি নিজেই সংবাদমাধ্যমকে ডেকে জানিয়েছেন। তিনি মির চঞ্চল। হুগলির আরামবাগের তিরোল পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর বুথের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি। বিধানসভা ভোটের সময়েও ছিলেন তিরোল পঞ্চায়েত এলাকার ভোটার। সেখানকার নৈসরাই এলাকায় তাঁর বাড়ি। এবার আরামবাগের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার হয়েছেন।

> দিদির দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব। সবাই চায় নির্বাচনে বাংলা মডেলের জয় হোক। জয় বাংলা।

কাঁটাবনী আজাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে ভোটও দিলেন। নিজেরটা তো বটেই। তারপরে একটার পরে একটা।

ভোটের সকালে ভোটগ্রহণ পর্বের শুরু থেকেই আরামবাগে শাসক দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস এবং ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তোলে সব বিরোধী দল। নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট তলব করলে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন দরাজ শান্তির সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। আর তাতেই মির চঞ্চল অবাধে ভোট করে গিয়েছেন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, প্রথমবার বুথে ভোট দিতে ঢোকেন সকাল ৯টা নাগাদ। নিজের মুখে ওই তৃণমূল নেতা কী বললেন? বলেন, 'আমি দলের সৈনিক। দলকে জিতিয়ে উন্নয়ন জারি রাখতে চাই। দল আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছে, তাই করেছি।' গত বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাপট নিয়ে ক্ষোভও উগরে দেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ওরা (কেন্দ্রীয় বাহিনী) থাকায় ১০ বার ভোট দিতে ১০টা জামা বদলাতে হয়েছিল। এবার রাজ্য পুলিশের পরিচালনায় পুরভোটে এক জামাতেই প্রায় ৪০টা ভোট দিয়েছি।'

ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী সুকুর আলি অবশ্য মির চঞ্চলকে চেনেন না বলে দাবি করেছেন। তাঁর দাবি, 'বিরোধী এজেন্টরা কেউ না থাকলেও সুষ্ঠু ভোটই হয়েছে। বুথ দখল বা ছাপ্পা ভোটের প্রশ্নই নেই।' আচ্ছা বিরোধী দলের এজেন্টরা ছিল না তো দিদি বলুন আপনি কী করবেন? আপনার পক্ষে তো আর সবার জন্য এজেন্ট জোগাড় করে দেওয়া সম্ভব নয়! সুতরাং, একতরফাই ভোট হবে। আমার তো মনে হয় দিদি, নিজের দলের থেকেই বিরোধী সাজিয়ে কিছু একটা করুন। তাতে বদনাম ঘুচবে। বিরোধী দলের এজেন্টদের বসতে না দিলেও ছবিতে দেখা যাবে সবাই বসে আছে। কুমোরটুলি থেকে পিছনে তৃণমূলের স্ট্যাম্প মারা বিরোধী দলের এজেন্ট বানিয়ে নিলে কেমন হয়! কিংবা একটু পয়সা খরচ করে মোমের এজেন্ট!

যাক। এসব কথা থাক। দিদি অভিনন্দন। আপনিই এখন এই রাজ্যের একামেবাদ্বিতীয়ম হয়ে থাকুন। আগামীতে দেশের। আপনার দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব। সবাই চায়। নির্বাচনের বাংলা মডেলের জয় হোক। জয় বাংলা। □

করোনার মধ্যেই যুদ্ধের ছোবল

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত শতাব্দীতে বড়ো হওয়া মানুষেরা কয়েকটা প্রায় জীবনের সঙ্গী হয়ে ওঠা কথা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। তখন এত টিভি চ্যানেলের দৌরাত্ম্য না থাকলেও মিটিং মিছিলের আকাল ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, মার্কিনিদের কালো হাত ভেঙে দাও এমন

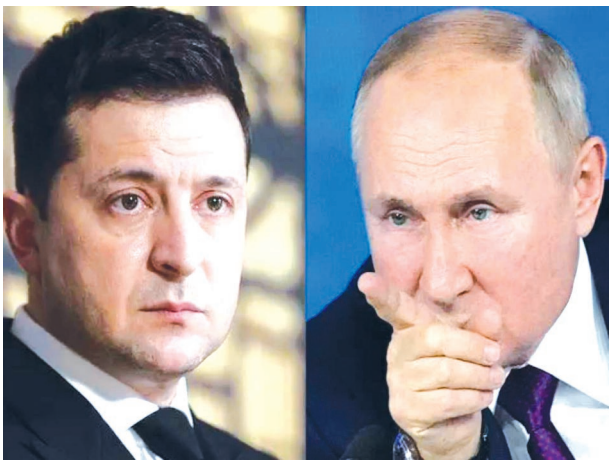

সব স্লোগান হরির লুঠের মতো (এ কথাটাও এখন প্রায় অচল হয়ে গেছে) রাজপথগুলিতে নিত্যদিনই ছড়িয়ে পড়ত।

২৪ ফেব্রুয়ারির প্রাতঃকাল থেকেই সেই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ কথাটা একটু অচেনা মুখ থেকে উঠে আসছে অগুনতি বার। রাশিয়া তার সীমান্ত দেশ ইউক্রেনের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করেছে। অনবরত যুদ্ধবিমান বোমাবর্ষণ করে ইউক্রেনের অস্ত্রভাণ্ডার ধূলিসাৎ করছে। সংবাদ সংক্রান্ত টিভি চ্যানেলগুলি এমন এমন রোমহর্ষক খবর পেয়ে প্রায় আত্মহারা। উন্নত প্রযুক্তির দৌলতে আটপৌরে হিন্দি চ্যানেলগুলিও অক্লান্তভাবে যুদ্ধের সংবাদ শুনিয়ে শুনিয়ে দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

কিন্তু রাশিয়া কি ৯০-এর দশকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন দেশ হয়ে যাওয়া পূর্বতন সঙ্গীদের আগে আক্রমণ করেনি? এই ইউক্রেনকেই তো তারা ২০১৪ সালে আক্রমণ করেছিল। সকলেই জানেন সেই আক্রমণের পর ইউক্রেনের পূর্বাংশের ক্রিমিয়া অঞ্চল রাশিয়া কেড়ে নেয়। তার নজর ছিল আরও একটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ইউক্রেনেরই ডনবাস নামের অঞ্চলে। এখানেই নতুন করে আক্রমণ শানাচ্ছে সাম্যবাদী রাশিয়া। রাজধানী কিয়েভও টলমলো। কিন্তু বিষয়টাকে অত চেনা গতে ফেললে হবে না। আর একটি সাম্রাজ্যবাদী ভাই যার বিরুদ্ধে স্লোগানে মাতোয়ারা ৭০-৮০ দশকের যৌবন সাক্ষী ছিল তারাও একইভাবে আফগানিস্তান, তার আগে ইরাকে বোমাবর্ষণ ছাড়াও দীর্ঘদিন পদাতিক বাহিনীও মোতায়েন রেখেছিল। দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে পুরো দমে মদত দিয়েছিল। উদ্দেশ্য একটাই সেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনে নিজেদের পছন্দের সরকার তৈরি করে বাঁকা পথে সেখানকার সম্পদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা। অঙ্গুলি হেলনে চলা এই সমস্ত সরকারকে পণ্ডিতরা তাঁদের পরিভাষায় 'ব্যানানা রিপাবলিক' বলে থাকেন।

এই প্রেক্ষিতে আজ হঠাৎ খবর— বোমা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রাবল্যে ভেসে যাওয়া আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যদি না টাটকা যুদ্ধচিত্র বা নিঃসহায় শিশুর কান্না দেখার বিশেষ কোনও বদখেয়াল থাকে। ১৯৯৯ সালে জর্জিয়া প্রদেশের নিকটবর্তী চেচনিয়ার ওপর রাশিয়ান আক্রমণ হয়নি? সরাসরি সম্মুখ সমর মাস-দশেক চললেও সেই চেনা ছকেরই প্রয়োগ হয়েছিল— দীর্ঘদিন দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দিয়ে দেশকে সন্ত্রস্ত করে তোলা। ফলও পাওয়া গিয়েছিল হাতেনাতে। রাশিয়ার তাঁবেদার একটি তথাকথিত নির্বাচিত সরকার বসেছিল। এই সরকারের বিরুদ্ধাচরণেও কমতি ছিল না চেচনিয়াবাসীর বহুলাংশের। কিন্তু শেষমেশ চেচনিয়া রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্তর্গত হতে বাধ্য হয়। রাশিয়া তাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করে। নামটা তো চেনাচেনা লাগছেই 'চেচনিয়া'! টিভিতে দেখা যুদ্ধের প্রকোপ এত ছিল না তখন। তাই হারানিধি পুনরুদ্ধারের এই চলমান কাহিনিচিত্রগুলিকে আমরা অতটা উপভোগ করতে পারিনি।

হারানিধি পুনরুদ্ধারের কথাটা এই জন্য বললাম যে 'কাস্তে হাতুড়ি তারা' মার্কা (আমাদের সিপিএম এখনও জাপটে থাকে) সোভিয়েত পতাকা ১৯৯১-এর ২৫ ডিসেম্বর শেষবার ক্রেমলিনে উড়েছিল। এর পর থেকে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত রাশিয়ান পতাকা ওড়া শুরু হয়, রাষ্ট্রপতি ছিলেন বরিস ইয়েলৎসিন। বজ্রকঠিন সাম্যবাদী শাসন যে এমন নিঃসাড়ে অপসারিত হবে তা বিশ্বের মানুষ ভেবে কুলকিনারা পায়নি। তখন আর্মেনিয়া থেকে সেই মজাদার নামধারী আজেরবাইজান, কাজাকাস্তান, তাজাকাস্তান, কিরগিস্তান হয়ে (হায়! যদি একটা দেবস্থান অন্তত যদি থাকত) সোভিয়েত কত্তাদের উজবুক বানিয়ে উজবেকিস্তানের মতো ১৫টি দেশ নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। তারা নিজেদের রিপাবলিক বলে পরিচয় দিয়েছিল।

এর কারণ বিচিত্র কিসিমের বিচিত্রতম বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা দিয়ে এসেছেন। তবে সাধারণ মানুষ জানে এতগুলি দেশের নাগরিকদের সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্রজমুষ্ঠির অধিগত হওয়ার আগে তাদের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস এমন অনেক কিছু যা সাধারণ মনুষ্য চরিত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ হতে পারে সেসব ছিল। কিন্তু শ্রেণী বিভাজনের একমাত্রিকতায় তারা হাঁপিয়ে উঠেছিল। এখন

যে কথাটা খুব চলে, আইন আদালতে শোনা যায় সেই 'ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স' অভ্যন্তরীণ জাতিদ্বন্দ্ব যে দায়ী সেটা আর বলে দিতে হয় না। দেশের অভ্যন্তরে অত্যাচার— এমন সব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় নিয়ে আজকের যুগের ধ্রুবতারা ভিন্নার্থে প্লেটো, সক্রেটিস— কানহাইয়া কুমার কিংবা উমর খালিদরা কিন্তু গবেষণা করেন না। শুনেছি তাঁরা জেএনইউ-তে প্রচার করেন, মা দুর্গা ও অসুরের অবৈধ সম্পর্ক ছিল বা বনবাসে থাকাকালীন রাম-সীতার সংসারে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অর্থাৎ গার্হস্থ্য হিংসার খবর পেয়েই নাকি রাবণ মানবাধিকার লঙ্ঘন আটকানোর মহান তাগিদে সীতাকে বহুরূপী হয়ে উদ্ধার করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

যাই হোক, এই ভাবে হারাধনের ১০ নয় ১৫টি ছেলে যে হারিয়ে গেল তার জন্য হারাধনের পিতৃশোক অত দ্রুত বিলীয়মান হতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ আকারে মাঝে মাঝেই চেচনিয়া, ক্রিমিয়া, ইউক্রেনের মতো পিতৃপরিচয় অস্বীকার করা দেশগুলির ওপর লোভাতুর দৃষ্টি ও অস্ত্রাঘাত করে। কিন্তু তবুও খেলাটি মোটেই কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী তকমা দিয়ে দাগিয়ে দিলে অন্যায় হবে। সোভিয়েত নাম খুইয়ে স্বাধীন হওয়ার পর নতুন দেশগুলি কিছুটা অনাথ বোধ করতে থাকে। তারা জানে পূর্বতন একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা তাদের ওপর নজর রাখছে। তাই অন্য বড়দা আমেরিকার দাদাগিরিতে তৈরি North atlantic treaty organisation-এর সমর্থন জোগাড়ের চেষ্টায় থাকে। এর মধ্যে আলোচ্য ইউক্রেন ১৯৯৭ সালের পর থেকেই Euro atlantic Partnership Council-এর সদস্য। বিচ্ছিন্ন হওয়াদের মধ্যে আরও ১১টি ভাইও আছে। কিন্তু মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও সামরিক সাহায্য কেবলমাত্র ন্যাটো (NATO) সদস্য আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির সঙ্গে অন্য আরও বেশ কিছু মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, গোয়া বা মণিপুর মাপের (মোট ৩০টি) যেমন লাটভিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মন্টেনিগরোর মতো কুচোকাঁচার দেশই পেতে পারে। বিপদে ন্যাটো এদের সামরিক সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাস্তবে কতটা করবে সেটা অন্য কথা। ইউক্রেনের এখানে অন্তর্ভুক্তি বর্তমানে আমেরিকা, ব্রিটেনের সুবিবেচনায় রয়েছে। এগুলি জটিল আন্তর্জাতিক কূটনীতির বিষয় হলেও নিজেদের দেশের দিকে তাকালে বেশ সহজে মোটা মাথাতেও ঢোকানো যায়। যেমন দেশভাগ এবং পরে বাংলাদেশ সৃষ্টির শোক ভুলতে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন তৈরি করে ভারত থেকে আলাদা করার যে চেষ্টা পাকিস্তান চালায় তেমনটাই ইউক্রেনে অনেকদিন ধরে চলছে।

আবার বাস্তবে যদি ইউক্রেন ন্যাটো সদস্যপদ পায় সেক্ষেত্রে ৩০ দেশের মিলিত বাহিনীর রাশিয়ার সীমান্ত ইউক্রেনে উপস্থিতি কি রাশিয়ার অভিপ্রেত হবে? আমাদের ভুটান সীমান্ত ডোকলামে চীনের উপস্থিতিতে ন্যায়সঙ্গতভাবেই আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সৈন্যবাহিনী বিরাট পরাক্রম দেখিয়ে সেখানে চীনা বাহিনীর চোখে চোখ রেখে জীবন বাজি রেখে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বর্তমানে কংগ্রেস, তৃণমূল বা আর কিছু দল ছাড়া সবাই দেশের নিরাপত্তার কথা ভাবে, সঠিক ভাবে রাশিয়াও তাই সেটা হতে দিতে চায় না। তারা ইউক্রেন আক্রমণ করে সীমিত সামরিক শক্তির দেশটিকে আত্মসমর্পণ করিয়ে তাদের ন্যাটোর সদস্য সঙ্গী হওয়া আটকাতে চায়। পুরো দেশটি অধিকার করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, এমনটাই যুদ্ধ ইতিহাসবিদ ও পূর্বতন সামরিক কর্তাদের অভিমত।

আজকের পৃথিবীতে কেউই চোখ বুজে 'হিন্দি-চীনি ভাইভাই' বলে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করে না বা উদাসীন ভাবে সৈন্যের জীবনের বিনিময়ে পরাজয় মেনে দেশের অংশ অবলীলায় আক্রমণকারীর কবজায় ছেড়ে দেয় না। কী দার্শনিকতাপূর্ণই না ছিল সেই উক্তি— ভারতের 'লে' অঞ্চল যেটি চীন কেড়ে নিয়েছে সেখানে 'কারুর টাকে যেমন একটিও চুল গজায় না, সেখানেও একটি ঘাসও গজায় না।' আবার আগুয়ান বিজয়ী সেনাবাহিনীকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে বিপুল ভারতীয় অঞ্চল পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া। যার কিছু অংশ তারা আবার চিরশত্রু চীনের হেফাজতে দিয়ে দিয়েছে।

এমনটা এখন কেউই করে না। বিশ্বে জাতীয়তাবাদের উত্থানে এমন অর্বাচীনতা এখন অচল। তবে সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ রাশিয়ার আক্রমণের সময়টি। তারা ভালো জানে ওসব sanction ইত্যাদি জারি করে প্রতিপক্ষ বিশেষ কিছু করতে পারবে না। ক্রিমিয়ার সময়েও তা হয়েছিল। কালক্রমে যা ভোঁতা হয়ে যায়। পোখরানে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পর ভারতেও হয়েছিল। তাই নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন যে কোনো সময়েই প্রামাণ করা যায়।

আজ পৃথিবী যখন করোনার ছোবলে বিধ্বস্ত, বিশ্বের প্রতিটি অর্থব্যবস্থা বিপন্ন, মানুষের দুর্গতি সীমাহীন— ঠিক সেই সময়ে কোনো দেশকে আক্রমণ করা নিতান্তই নিষ্ঠুরতা ও সম্পূর্ণ মানবিকতা- রহিত। ইউক্রেনের মানুষ আজ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও অসুরক্ষিত বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদ নামের প্রতিষ্ঠানটি যেখানে ভবের ঠাট মাত্র। □

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গঙ্গাসাগর জেলার ডায়মন্ডহারবার নগরের স্বয়ংসেবক এবং আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক ডাঃ আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। গত কয়েক মাস ধরে তিনি ফুসফুসের সংক্রমণে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬২ বছর। তিনি তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র নাবালক পুত্রকে রেখে গেছেন। ১৯৮৮ সালে তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। মুখ্যশিক্ষক থেকে ক্রমে ক্রমে জেলা কার্যবাহ ও বিভাগ কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। গঙ্গাসাগর জেলার সঙ্ঘকার্যের প্রসারে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা বর্তমান স্বয়ংসেবকদের কাছে পাথেয়স্বরূপ। এছাড়া তিনি ভারতীয় হোমিওপ্যাথি সমাজের প্রান্তীয় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানে আরোগ্য ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

ওয়েসিদের শিক্ষা দিতে হর্ষের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক

রাজু সরখেল

কর্ণাটকে হিজাব বিতর্কের মাঝেই হিন্দু যুবক হর্ষকে কুপিয়ে হত্যা করার খবর দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আমতায় আনিসের মৃত্যু ঘিরে বাম ছাত্র সংগঠন ও জেএনইউ-র অতিবাম ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে দোষীদের শাস্তির দাবিতে। দেখে মনে হচ্ছে সামনেই নির্বাচন। এর মাঝেই কর্ণাটকে হিন্দু যুবক হর্ষকে কুপিয়ে হত্যা করা হলো। প্রতিবাদে হর্ষের জন্য ডান বাম ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলনে নামবে তা আশা করা যেতেই পারে। কারণ এরা তো নিজেদের সবসময় সেকুলার বলে থাকেন। তাহলে আনিসের মৃত্যুতে আন্দোলন আর হর্ষের মৃত্যুতে নীরবতা কেন? অদ্ভুত হলেও এরই নাম রাজনীতি। বাম বুদ্ধিজীবী ও বাম ছাত্র সংগঠন হর্ষের মৃত্যু ঘিরে একটি বাক্যও খরচ করল না। এটাই কি বাম ছাত্র সংগঠনের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি? প্রশ্ন রাখতে চাই বাম বুদ্ধিজীবীদের কাছে, কোথায় আপনাদের বিবেক, কোথায় আপনাদের মনুষ্যত্ব?

হাজার হাজার হর্ষ জেহাদিদের হাতে প্রাণ দিচ্ছেন দেশের জন্য। আরও কোটি কোটি হর্ষ তৈরি আছে মায়ের সম্ভ্রম রক্ষা করতে। একমাত্র বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে দেখা গেল রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে।

ভারত গণতান্ত্রিক দেশ বলেই রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে লালপন্থী টুকরে টুকরে গ্যাং ও মিম দলের সুপ্রিমো। শুনেছি ওয়েসি নাকি লন্ডন ফেরত ব্যারিস্টার। শিক্ষিত একজন মানুষ হয়েও মাঝে মাঝেই উনি বিতর্কিত মন্তব্য করেন, যা উগ্র সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রতিফলন। মুক্তার আব্বাস নাকভি, এপিজে আব্দুল কালাম, শিক্ষাবিদ মাসুম আক্তার-সহ নিরপেক্ষ ভারতীয় মুসলমান সমাজের সমাজকর্মী, লেখক-লেখিকা, বুদ্ধিজীবীরা হিজাবের বিপক্ষে মত দিয়েছে। কিন্তু ওয়েসি-সহ কট্টর মোল্লাবাদীরা হিজাবের পক্ষে। হিজাবকে কেন্দ্র করে রাজনীতি এতটাই

নীচে নেমেছে যে হিন্দুস্থানকে আবার টুকরো করার চক্রান্ত চলছে।

হিজাব বিতর্কে 'হিজাব কিতাব' সংবলিত বক্তব্য রেখেছেন ওয়েসি। উদ্দেশ্য, আগামী বছর কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন। তাই, 'যেন তেন প্রকারেণ' বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্য নিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে মুসলমান ছাত্রীদের মগজধোলাই করে, আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি দিয়ে স্কুলে প্রবেশ করিয়ে ভারত ভাঙার মরিয়া চেষ্টায় আইএসআই-সহ জঙ্গি সংগঠনগুলো। মুসলমান ছাত্রীদের দিয়ে ঘৃণ্য কাজ করাচ্ছে জেহাদি শক্তিগুলি। এদের হাত মজবুত করছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও চীন। কিন্তু ভারতে এই চক্রান্ত রুখতে জাতীয়তাবাদী মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রবাদী দলও রয়েছে। তাই অত সহজে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এই ডামাডোলের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন চলছে। তার মাঝেই ওয়েসির বক্তব্যের ভিডিয়ো ক্লিপ খুব ভাইরাল হয়েছে। কিছুদিন আগেও উনি বলেছিলেন, 'যোগীজী সারাজীবন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না আর মোদীজীও সারাজীবন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। যোগীজী চলে যাবেন মন্দিরে আর মোদীজী চলে যাবেন পাহাড়ে।' এই উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন ওয়েসিকে উত্তরপ্রদেশে ঢুকতে দেয়নি। ওয়েসির উস্কানিমূলক বক্তব্য যে কোনো সময় দাঙ্গা বাঁধাতে পারে। এই বক্তব্যের পর ডান বামের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এতেই পরিষ্কার, বিজেপি বিরোধিতা করে হিন্দুদের গালিগালাজ করলেও ওয়েসির সাতখুন মাফ। বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসা হিন্দুদের আবার দেশ ছাড়ার হুমকি দেবার পরেও ডান বাম বুদ্ধিজীবীরা নীরব। প্রত্যেক দলের দৃষ্টিভঙ্গি ও দলের নীতি আদর্শ তো সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। প্রত্যেক দলের কর্তব্য হলো দেশ ও জাতির প্রতি সম্মান আর সম্প্রীতি বজায় রাখা। বিগত বছরগুলোতেও নাসিরউদ্দিন, শাবানা আজমি, আমির খান, শাহরুখ খান, জাভেদ আখতারের মতো সেলিব্রিটিরা ভারতে থেকে পাকিস্তানের গুণগান গেয়েছেন আর বলেছেন ভারত অসহিষ্ণু দেশ। বলেছেন, এই দেশে তারা সুরক্ষিত নন। এই দেশে থাকতে অসহায় বোধ করছেন বলে প্রেস কনফারেন্স করেছেন। এই সমস্ত ব্যক্তি নিজেদের সবসময় প্রচারে রাখতে চান। ১২০ কোটি হিন্দু গাঁটের কড়ি খরচ করে সিনেমা দেখে এদের বাঁচিয়ে রেখেছেন আর আজকে এরাই হিন্দুদের আক্রমণ করছেন, তলে তলে চলছে হিন্দু নিধন ও উৎখাতের চেষ্টা। ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, পাক্ষিক, ভাষা ভিত্তিক সংবাদপত্র ও টিভি মিডিয়া যোগী ও মোদীজীর কুৎসা রচনা করে চলেছে। সম্প্রতি একটি বাংলা সংবাদপত্র ছেপেছে যোগীর রাজ্যে নাকি সবচেয়ে বেশি মহিলা নিগ্রহ হয় এবং মহিলারা সুরক্ষিত নয়। সেই পত্রিকার সম্পাদকের কাছে অনুরোধ যে ধর্ষণকারীদের নামের তালিকা প্রকাশ করবেন পাশাপাশি বাঙ্গলায় মহিলা শিশু নিগ্রহ ও ধর্ষণের সংখ্যা এবং ধর্ষণকারীদের নামের তালিকা প্রকাশ করবেন।

ওয়েসিদের শিক্ষা দিতে হর্ষের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। ভারত বিরোধীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে, নতুন ভারত নির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক। □

মাঘমাসের পূর্ণিমা তিথিতে

চন্দ্রভানু ঘোষাল

টাইম মেশিন কি ভাড়ায় পাওয়া যায়? যদি নাও পাওয়া যায় অসুবিধা নেই। এই নিবন্ধের খাতিরে ধরে নেওয়া গেল পাওয়া যায়। পাঠকদের কাছে অনুরোধ আজগুবি বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে না দিয়ে আসুন, আমরা টাইম মেশিনে উঠে বসি। আমাদের গন্তব্য ১৩০৯ সাল। আমরা যেতে চাই মাঘ মাসের এক ভোরে। পঞ্জিকা অনুযায়ী সেদিন মাঘী পূর্ণিমা। টাইম মেশিনে চড়ে আমরা যাত্রা করব বর্তমান হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের কাছে ত্রিবেণীতে। পাঠক জানেন ত্রিবেণী গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগেও আছে এমনই এক নদী সঙ্গম। সেখানে গঙ্গা আর যমুনা মিলিত, সরস্বতী মুক্ত। ত্রিবেণীতে গঙ্গা আর সরস্বতী মিলিত, যমুনা মুক্ত। প্রয়াগের সঙ্গমকে বলে যুক্তবেণী, ত্রিবেণীর সঙ্গম মুক্তবেণী। প্রয়াগ বিখ্যাত কুম্ভমেলার জন্য। আর ত্রিবেণী কেন বিখ্যাত সেই কথাটা জানার জন্যই আমরা টাইম মেশিনে যাত্রা শুরু করেছি।

আজকের ত্রিবেণী শহরকে আমরা হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান হিসেবে জানি। চৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে ১৩০৯ সালের। চৈতন্যদেব তখনও ধরাধামে অবতীর্ণ হননি। তখন পাঠান আমল। সপ্তগ্রাম তখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বন্দর। সারা দেশের অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভরশীল এই বন্দরের ওপর। কিন্তু বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের পর অর্থাৎ বঙ্গের শাসনভার পাঠানদের হাতে চলে যাওয়ার পর কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে সপ্তগ্রামের সেই রমরমা আর নেই। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা বলবেন সরস্বতী নদীর স্রোতোধারা দুর্বল হয়ে যাবার কারণেই সপ্তগ্রামের এই দশা। কিন্তু সেটা একটা কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। যাক সে কথা, সপ্তগ্রাম এই নিবন্ধে আলোচনার বিষয় নয়। আপাতত আমরা পৌঁছে গেছি ১৩০৯ সালের ত্রিবেণীর ঘাটে। কিন্তু কী দেখছি? সূর্যোদয় হতে এখনও অনেক দেরি। রাতের অন্ধকারেই কয়েকজন সাধু এবং গুটিকয়েক স্থানীয় মানুষ মুক্তবেণীর সঙ্গমে স্নান করছেন। করবেনই-বা না কেন? কয়েকশো বছর ধরে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে ত্রিবেণীর সঙ্গমে স্নান কুম্ভস্নান নামে পরিচিত। প্রাচীন শাস্ত্রেও এই স্নানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ সাধুসন্ত এবং সাধারণ তীর্থযাত্রী পুণ্যকামী মানুষ কুম্ভস্নান করতে আসেন। স্নান ও মেলাকে কেন্দ্র করে উৎসবের রেশ ছড়িয়ে পড়ে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলে। মেলায় নানারকম জিনিসপত্র বিক্রি করে যে বিপুল অর্থাগম হয় তাতে পুষ্ট হয় সারা বঙ্গের অর্থনীতি। কিন্তু এ বছর ভিড় এত কম কেন? যাঁরা স্নান করছেন তাঁদের সকলেরই চোখে কেমন একটা ভয়। দূরে কোনও মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে বটে কিন্তু সেই শব্দও ভারী কুণ্ঠিত। এই বুঝি কেউ শুনে ফেলল— এমনই এক দ্বিধা বাদকের মনে! এক মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ বালক তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অবগাহন স্নান করছে। এক ডুব...দুই ডুব...বাবার আতঙ্কিত দৃষ্টি পাড়ের দিকে। তিনবার ডুব দেওয়ার পর বালক বলল, 'বাবা আমার হয়ে গেছে। এবার কি আমরা ফিরে যাব?' বাবা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, 'হয়ে গেছে! শিগ্‌গির চল। পাঠান সেনারা যদি জানতে পারে নিষেধ অমান্য করে আমরা স্নান করতে এসেছি তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।' —যত দ্রুত সম্ভব ওরা একে অপরের হাত ধরে ফিরে চলল পাড়ের দিকে। কিন্তু বিধি বাম! পাড় থেকে ওরা যখন সামান্যই দূরে ঠিক তখনই শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। ঘাটে পড়ে থাকা জিনিসপত্রের মায়া ত্যাগ করে ছেলেকে নিয়ে বাবা ভিজে

ত্রিবেণীতে যা হলো তার জন্য কোন রাজনৈতিক শক্তি দায়ী বা বর্তমান শাসকের রাজনৈতিক রং সবুজ না অন্য কিছু সেই হিসেব কষার এখন কোনও মানেই হয় না। যে পরিবর্তন সমাজের মঙ্গলের সূচনা করে তাকে খোলা মনে গ্রহণ করাই বিধেয়। ত্রিবেণীতে কুম্ভস্নানের পুনঃপ্রবর্তন তেমনই এক সামাজিক মঙ্গলের শুভ সূচনা।

জাতে ওঠার লোভে নিজের পরিচয় চালাকির আড়ালে গোপন করার মধ্যে কোনও আধুনিকতা নেই। ত্রিবেণীর ঘটনা যদি একটা ট্রেলর হয় তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বা অন্য কোনও কারণে শাসক এখন জাতের সংজ্ঞাটাই কিঞ্চিৎ বদলাতে চাইছে।

পোশাকেই দৌড়ে গেল অনতিদূরে জঙ্গলের দিকে। তাদের আর দেখা গেল না। অন্য স্নানার্থীদের কী হলো? সেটা সহজেই অনুমেয় পাঠক। শাসকের নিষেধ অমান্য করার অপরাধে সবাইকে ধরে নিয়ে গেল পাঠান সেনারা। বিচার নামক প্রহসনের পর প্রত্যেককে খুন করল জল্লাদরা। পরের বছর থেকে বন্ধ হয়ে গেল ত্রিবেণীর কুম্ভস্নান।

ঘটনাটি কাল্পনিক। চরিত্রগুলিও তাই। তবে পাঠান শাসকের রক্তচক্ষুর কারণেই যে কয়েকশো বছর ধরে প্রচলিত ত্রিবেণীর কুম্ভস্নান বন্ধ হয়ে ছিল তার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, ত্রিবেণীর বন্ধ হয়ে যাওয়া কুম্ভস্নানের ঐতিহাসিকতা প্রতিষ্ঠা করতেই কি এই কাল্পনিক ঘটনার অবতারণা? অবশ্যই তা নয়। প্রকৃত কারণটি হলো, এ বছর, অর্থাৎ ২০২২ সালে, ৭১৩ বছর পর ত্রিবেণীতে আবার শুরু হয়েছে কুম্ভস্নান। আজকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহে ঘটনাটি যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর এই পশ্চিমবঙ্গেই সরস্বতী পুজোয় আমরা মূর্তি ভাঙার ঘটনার সাক্ষী হয়েছি।

ডায়মন্ড হারবারে একটি স্কুল সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দিয়েছে। বাদাম ভাজা শীর্ষক গানের সঙ্গে গলা মেলানো কলকাতা শহরের একাধিক বুদ্ধিজীবী সেকুলার রাষ্ট্রের স্কুলে সরস্বতী পুজো কেন করা হবে বলে প্রশ্ন তুলেছেন। চোখটা যদি একটু অন্যদিকে ঘোরাই তাহলে দেখা যাবে সারা দেশে হিজাব নিয়ে জোর বিতণ্ডা চলছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ দাবি করেছে তাদের মেয়েদের হিজাব পরে স্কুলে যেতে দিতে হবে। তাই চানাচুর বা বাদাম ভাজাওয়ালারা মুসলমানদের দাবিদাওয়া নিয়ে সাধারণত নীরবই থাকেন। সেকুলার রাষ্ট্রে হিজাব পরে স্কুলে যাওয়া কতটা ন্যায়সঙ্গত তাই নিয়ে তারা সাহস করে বারদুয়ারির বাংলার ঠেকেও আলোচনা করেন না। বাঙ্গালির সৌভাগ্য, পশ্চিমবঙ্গের সবাই এদের মতো শিরদাঁড়া নিলামে তোলেননি। মুর্শিদাবাদের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিজাব পরে আসায় এক মুসলমান ছাত্রীকে স্কুলে ঢুকতে দেননি। একজন প্রকৃত শিক্ষকের মতো তিনি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন শৃঙ্খলাকে। তাঁর মনে হয়েছে স্কুলে সব ছাত্র-ছাত্রীকে ইউনিফর্ম পরে আসতে হবে। হিজাব বা নামাবলী পরে এলে তাকে ক্লাস করতে দেওয়া হবে না। হক কথা কইসেন মাস্টারমশায়! কিন্তু হক কথা বলার জন্য তাঁকে খেসারতও দিতে হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের শাসক সাধারণত ইসলামিক মোল্লাতন্ত্রের স্বার্থবিরোধী কেউ কিছু করলেই দায়িত্ব সহকারে তার কান মলে দেয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বদ্‌তমিজ হেড মাস্টারকে পত্রপাঠ বদলি করা হয়েছে অন্য স্কুলে। পশ্চিমবঙ্গের এহেন রাজনৈতিক আবহে ৭১৩ বছর পর একটি হিন্দু ধর্মীয় প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করা তাৎপর্যপূর্ণ নয়? কী বলেন পাঠক?

সব পরিবর্তন স্থায়ী হয় না। বিশেষ করে আকস্মিক বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় তা অনেকাংশেই ক্ষণস্থায়ী। আমরা সোভিয়েত রাশিয়া দেখেছি, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনও দেখেছি। এরা কেউই আর তথাকথিত কমিউনিস্ট নয়। পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। রাশিয়া ইউক্রেনে আর চীন ভারত সীমান্তে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও আমরা 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব' বা 'মা-মাটি- মানুষ'— গোছের অনেক মুখরোচক স্লোগান শুনেছি। কিন্তু সবই ফাঁকা আওয়াজ হয়ে থেকে গেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে ত্রিবেণীতে আগামী বছরেও কুম্ভস্নান হতে পারবে কি না কিংবা এই পরিবর্তন স্থায়ী হবে কিনা তা সময়ই বলবে। কিন্তু যা হয়েছে তাও বড়ো কম নয়। অন্তত এই শাসকের কাছে এটুকুর প্রত্যাশাও তো ছিল না।

আরও একটি কথা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ত্রিবেণীতে যা হলো তার জন্য কোন রাজনৈতিক শক্তি দায়ী বা বর্তমান শাসকের রাজনৈতিক রং সবুজ না অন্য কিছু সেই হিসেব কষার এখন কোনও মানেই হয় না। যে পরিবর্তন সমাজের মঙ্গলের সূচনা করে তাকে খোলা মনে গ্রহণ করাই বিধেয়। ত্রিবেণীতে কুম্ভস্নানের পুনঃপ্রবর্তন তেমনই এক সামাজিক মঙ্গলের শুভ সূচনা। এই শুভ কাজ সম্পন্ন করার জন্য শাসককে ধন্যবাদ দিতেই হয়। এ বছর যা হলো তাকে বাঁচিয়ে রাখাই এখন তাদের কর্তব্য। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির বিদায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েই ত্রিবেণীতে কুম্ভস্নান আবার শুরু করা হয়েছে। এ বছর সারা ভারত থেকে প্রায় তিনশো সাধুসন্ত পুণ্যস্নানে অংশ নেবার জন্য এসেছিলেন। আগামী বছর থেকে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। এবং অদূর ভবিষ্যতে ত্রিবেণী আবার প্রয়াগের সমতুল্য হয়ে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গের জীবনে আবার মাঘী পূর্ণিমা আসতে শুরু করেছে। অতঃপর অনেক বাঙ্গালিই নজর রাখবে ক্যালেন্ডারে। লাল কালির গোল দাগ টেনে বিশেষ দিনটির চারদিকে বেঁধে দেবে বেড়া। কলকাতার ব্যস্ত মোবাইলেও পৌঁছবে একটি মেসেজ। জাতে ওঠার লোভে নিজের পরিচয় চালাকির আড়ালে গোপন করার মধ্যে কোনও আধুনিকতা নেই। ত্রিবেণীর ঘটনা যদি একটা ট্রেলর হয় তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বা অন্য কোনও কারণে শাসক এখন জাতের সংজ্ঞাটাই কিঞ্চিৎ বদলাতে চাইছে। এরপর কলকাতা কী করে সেটাই এখন দেখার।

□

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

শুধু হিন্দু মন্দিরের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কেন?

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে আসার পর থেকে মন্দিরের ধনসম্পদের ওপর যে খবরদারি শুরু করেছিল আজও তা বহাল রয়েছে। এতে শুধু যে সরকার মাথা গলিয়েছে তা নয়, এতে অদক্ষতা বেড়েছে আর মন্দির-পুরোহিতদের শতাব্দী-প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। হিন্দু সমাজের মানুষজনকে আবার তাদের নিজেদের মন্দিরগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে।

ব্রিটিশরা আসার আগে পর্যন্ত মন্দিরগুলো দেখভাল করত স্থানীয় সম্প্রদায়সমূহ। সেগুলো ছিল শিল্পকলা, নৃত্যচর্চা এসবের কেন্দ্র। একটা বৃহৎ বিকেন্দ্রীভূত ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করত মন্দিরগুলি।

প্রত্যেক মন্দিরের দাতব্য তহবিল রাখা হতো। তার মধ্যে মন্দিরে প্রদত্ত সম্পত্তিও থাকত। সেই মন্দিরের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা সম্প্রদায়ের কল্যাণে যা ব্যবহৃত হতো। এইসব কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে ছিল বিশ্রামাগার, পাঠশালা, গোশালা এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান আর নিরন্নকে অন্ন দানের ব্যবস্থা।

ব্রিটিশদের অভিসন্ধি ছিল উপনিবেশ স্থাপন করা ও ধর্মান্তর করা। আর তা সফল করতে গেলে মন্দিরের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করতে হবে। কাজেই মন্দিরগুলোকে সরকারের অধীনে আনতে হবে। এটা বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে করা হয়েছিল, কারণ দক্ষিণ ভারতের মতো উত্তর ভারতের মন্দিরগুলো এত বিশাল সম্পদ বা সম্পত্তির অধিকারী ছিল না। ব্রিটিশরা এর জন্য ১৮১৭ সালে মাদ্রাজ রেগুলেশন-৭ প্রবর্তন করেছিল।

১৮৪০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে এক নির্দেশিকা জারি করে মন্দিরগুলোকে তাদের ট্রাস্ট বা অছি

> দি ম্যাড্রাস রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল এন্ডাওমেন্টস অ্যাক্ট, ১৯২৫-এর বিরুদ্ধে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা প্রবল আপত্তি জানাল। তাতে এই আইনকে নতুন করে মুসাবিদা করা হলো আর তখন খ্রিস্টান ও মুসলমানদের বাদ দেওয়া হলো। শুধুমাত্র হিন্দুদের রেখে দেওয়া হলো।

পরিষদের হাতে তুলে দিতে বলা হলো। কারণ ভারতের এবং ভারতের বাইরের খ্রিস্টান মিশনারিরা চাইছিল না খ্রিস্টানরা হিন্দু মন্দির পরিচালনা করুক। এইভাবে মন্দিরের দেখভাল ধীরে ধীরে ট্রাস্টিদের হাতে তুলে দেওয়া হতে লাগল। আর বিখ্যাত মন্দিরগুলোকে মঠের হাতে তুলে দিতে বলা হলো। এসব ঘটল ১৮৪৫ সালের মধ্যে।

তারপর এল রিলিজিয়াস এন্ডাওমেন্টস অ্যাক্ট ১৮৬৩ বা ধর্মীয় সম্পত্তি আইন। ব্রিটিশ সরকারের থেকে মন্দির পরিচালনার ভার ট্রাস্টিদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। অবশ্য পূজার্চনার মূল উদ্দেশ্য ও মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিলকে কাজে লাগানো কখনো ট্রাস্টিরা অবহেলা করেনি।

ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সির শত শত মন্দির নিজ নিজ ট্রাস্টির হাতে তুলে দেওয়া হলো। সরকারের সেসব দেখাশোনার প্রায় কোনো দায়িত্বই রইল ন। ট্রাস্টিরা মন্দিরের নীতি অনুসারে মন্দির চালাতে লাগল।

ব্রিটিশরা দি ম্যাড্রাস রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল এন্ডাওমেন্টস অ্যাক্ট, ১৯২৫ চালু করার আগে পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। এর বিরুদ্ধে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা প্রবল আপত্তি জানাল। তাতে এই আইনকে নতুন করে মুসাবিদা করা হলো আর তখন খ্রিস্টান ও মুসলমানদের বাদ দেওয়া হলো। শুধুমাত্র হিন্দুদের রেখে দেওয়া হলো। আর এর নতুন নামকরণ হলো দি ম্যাড্রাস হিন্দু রিলিজিয়াস অ্যান্ড এন্ডাওমেন্টস অ্যাক্ট, ১৯২৭। হিন্দুরা সেদিনও কোনো প্রতিবাদ জানায়নি আজও জানায় না।

পরিতাপের বিষয় এইটাই যে, ১৯২৫ সালে শিখ গুরুদ্বারা আইন পাশ হয়েছিল তাতে গুরুদ্বারাগুলোকে শিখদের নির্বাচিত সংস্থার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। সুতরাং ব্রিটিশরা মুসলমান, খ্রিস্টান ও শিখদের জন্য এক আইন আর শুধু হিন্দুদের জন্য আরেক আইন তৈরি করেছিল।

আজও হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, ধর্মীয় প্রথা সবই সরকারের নিয়ন্ত্রণে ও বিচারব্যবস্থার অধীন। সেই কারণেই শবরীমালা মন্দিরের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট আদেশ জারি করতে পেরেছিল।

কিন্তু অ্যাক্ট-৭, ১৯৩৫-এর দ্বারা ওই আইনে এক গুরুতর পরিবর্তন আনা হয়েছিল। এর ফলে সরকার যে কোনো সময়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে কোনো মন্দিরের শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। এইভাবে হিন্দু রিলিজিয়াস এন্ডাওমেন্টস বোর্ড মন্দির অধিগ্রহণ ও তার শাসনকাজ চালানোর ক্ষমতা গ্রহণ করল। এই বোর্ডে তিন থেকে পাঁচ জন পর্যন্ত সদস্য থাকতে পারত।

ভারতীয় পণ্ডিত ও লেখক সুভাষ কাক লিখেছেন, ১৯৬০ সালে সিপি রামস্বামী আইয়ারের নেতৃত্বে হিন্দু রিলিজিয়াস এন্ডাওমেন্টস কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকারগুলো তাদের এই নীতি নির্ধারণ করেছে যে হিন্দু মন্দির ও মঠগুলো জনগণের সম্পত্তি। যখন ভারত সরকার খুব প্রবলভাবে ভারতীয় জীবনযাত্রার সব ব্যাপারে নাক গলাচ্ছিল তখনই সরকার ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করল।

স্বাধীনোত্তর ভারতে তামিলনাড়ুতে ১৯৫১ সালে সরকার সব মন্দিরের দখল নিল, তাদের তহবিল দখল করল। তারা এটা করল ১৯৫১ সালে পাশ হওয়া হিন্দু রিলিজিয়াস অ্যান্ড এন্ডাওমেন্টস অ্যাক্ট, ১৯৫১-র জোরে। ম্যাড্রাস হাই কোর্টে এর বিরুদ্ধে সিরুর মঠ মামলায় চ্যালেঞ্জ জানানো হলো, তারপর সুপ্রিমকোর্টে। উভয় কোর্ট ১৯৫১-র বিধির অনেক ধারা বাতিল করল। এইভাবে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে দি তামিল নাড়ু হিন্দু রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল এন্ডাওমেন্টস অ্যাক্ট ১৯৫৯ সালে পাশ হয়েছিল। কিন্তু সরকারের দখলদারি বহাল রইল।

এতে বলা হয়েছিল যে এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে ধর্মীয় ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন যথাযথভাবে পরিচালিত হয় আর এইটা সুনিশ্চিত করা যেন আয়ের অসদ্ব্যবহার না হয়।

নতুন আইনে হিন্দু রিলিজিয়াস এন্ডাওমেন্টস বোর্ড বিলুপ্ত করা হলো। এর কর্তৃত্ব ন্যস্ত হলো একজন কমিশনার বা সচিব পদমর্যাদার অফিসারের অধীনস্থ হিন্দু রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল এন্ডাওমেন্টস দপ্তরের ওপর।

যদি সরকার মনে করে যে কোনো হিন্দু মন্দিরে প্রণামীর টাকা তছরূপ হচ্ছে তা হলে সে তার কমিশনারকে নির্দেশ দেবে তদন্ত করে তা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনতে। এই তহবিল তছরূপের সংস্থান কিন্তু খ্রিস্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পত্তির ওপর রাখা হলো না।

দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলোতে হিন্দু ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন। কেমনভাবে সরকার হিন্দু মন্দির চালনা করে? ধরা যাক, তামিলনাড়ুর পালনির দণ্ডায়থপানি স্বামী মন্দিরের কথা। হুন্ডিতে যা সংগ্রহ হয় তা মন্দিরের জন্য নিদিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। এর মধ্যে ১৪ শতাংশ প্রশাসনিক ব্যয়, ৪ শতাংশ অডিট খরচ (৯২ ধারা), ২৫-৪০ শতাংশ বেতন, আর ১-২ শতাংশ প্রার্থনা ও অন্যান্য উৎসবের জন্য। সংগ্রহের ৪ থেকে ১০ শতাংশ কমিশনারের সাধারণ কল্যাণ তহবিলে (কমিশনার কমন গুড ফান্ড) যায়। এর অতিরিক্ত তহবিল চলে যায় বিভিন্ন জনপ্রিয় সরকারি প্রকল্পে ব্যয়ের জন্য, যেমন বিনামূল্যে অন্নদান, বিবাহ ইত্যাদিতে।

এইভাবে মন্দিরের আয়ের থেকে ৬৫-৭০ শতাংশ মন্দির বহির্ভূত বা শুধুমাত্র প্রশাসনিক ব্যয়ে চলে যায়। লক্ষ্য করতে হবে যে অর্চক, যারা প্রার্থনা পরিচালনা করে, তাদের অতি সামান্য বেতন দেওয়া হয়, আবার কখনো কখনো কিছুই দেওয়া হয় না। তার ওপরে মন্দিরগুলো মূলত যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়— হিন্দুদের ধর্মীয় কাজের জন্য, যেমন বেদ পাঠশালা চালানো বা সনাতন ধর্মের জ্ঞান বিতরণ করা তার জন্য কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয় দেবতা বা দেবস্থানের নামে। যেহেতু এই মন্দিরগুলো স্টেট অ্যাক্টের অধীনে গঠিত তাদের আয় আয়করের ১০ ধারা (২৩ বিবিএ) অনুসারে আয়কর থেকে অব্যাহতি পায়।

কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরির ৩২ হাজার ৭৯৩ মন্দিরের মধ্যে ৭৮২টা মন্দিরকে ট্রাস্ট হিসেবে প্যান নম্বরের জন্য আবেদন করতে হয়েছিল। ট্রাস্টিদের নিয়ে ট্রাস্ট গঠন করার নিয়ম নতুন মন্দিরের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু যেসব মন্দির হাজার হাজার বছর আগে নির্মিত হয়েছিল তাদের জন্য নয়।

অতএব যদি কোনো ট্রাস্ট কোনো নির্দিষ্ট বর্ষে মোট দানের ৮৫ শতাংশের কম খরচ করে, ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে যে হারে যে পরিমাণ সংগ্রহ হয় আর যে পরিমাণ ব্যয় হয় তাদের মধ্যে যে তফাত তার ওপর আয়কর দিতে হয়।

সুতরাং মন্দিরের আয় হয় সরকার নির্বাচিত আধিকারিক দ্বারা ব্যয়িত হয় অথবা উদ্বৃত্ত অর্থ ফিক্সড ডিপোজিটে রাখা হয় আর তার ওপর আয়কর দিতে হয়। এইভাবে হিন্দু মন্দিরের টাকা সরকারের কোষাগারে জমা পড়ে।

এখন প্রশ্ন হলো—

(১) শুধুমাত্র হিন্দু মন্দিরের জন্য সরকার চায় যথাযথ পরিচালনা এবং এর আয় যেন সঠিক উদ্দেশ্যে হয়, কেন?

(২) হিন্দু মন্দিরে দানসমূহ কমিশনার বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রমে ব্যয় করে, কেন?

(৩) মন্দিরের সংগ্রহ কোনো বেদ পাঠশালা বা ভারতীয় দর্শন ও প্রথা শেখানোর উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় হয় না। কেন?

সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী বলেছেন, শ্রীরঙ্গম রঙ্গনাথন মন্দির ২০১০-১১ বর্ষে ১৮.৫৬ কোটি টাকা সরকারকে দিয়েছে মন্দির পরিচালনার জন্য। যেসব সেবাইত বেদ, পুরাণ পাঠ করেন তাদের বা দেবতার যাত্রা উপলক্ষ্যে পরিচালনা করেন যে পশুরামরা তাঁদের কোনো বেতন দেওয়া হয় না। ভক্তরা কিছু টাকা প্রণামী ব্যক্তিগতভাবে দিলে তার থেকে যা পায় তাই তাদের আয়।

প্রস্তাব হলো, অন্য ধর্ম যেমন খ্রিস্টান, মুসলমানদের ধর্মীয় উপাসনালয়ের জন্য এই আইন চালু হোক অথবা এক তরফাভাবে এই আইন হিন্দুদের ওপর চাপানো বন্ধ হোক।

আসল ফ্যাসিবাদী কারা, চিনে নিন

মহাকালেশ্বর উপাধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতা কোন ভয়ংকর স্তরে পৌঁছে গিয়েছে একটু ভেবে দেখুন। অসহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতা, ফ্যাসিবাদ-ফ্যাসিবাদ বলে যাঁরা সারাক্ষণ চিৎকার করেন, তাঁরা আসলে কত বড়ো ভণ্ড, মিথ্যাচারী ও প্রবঞ্চক, সেটা আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝে নিন—

শুধু তিনটে ছবি দেখাব। তার পরে বিচার সবাই নিজে নিজেই করতে পারবেন—

ছবি-১ : কর্ণাটকের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে এক ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাত্রী কালো হিজাব পরে ঢুকলেন। শ'খানেক হিন্দু ছাত্র তেড়ে এল। তাদের সবার গলায় গৈরিক উত্তরীয়। ইউনিফর্ম না পরে হিজাব কেন? এই প্রশ্নে তারা ওই ছাত্রীর বিরোধিতা করতে লাগল। স্লোগান উঠল ঘিরে ধরে। ওই ছাত্রী পালটা স্লোগান দিল 'আল্লাহু আকবর' বলে। উত্তেজনা আরও বাড়ল। কিন্তু ওই ছাত্রীর কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করল না।

ফলাফল : গোটা দেশ জুড়ে কোলাহল। বিদেশেও কোলাহল। অসহিষ্ণুতা- অসহিষ্ণুতা, ফ্যাসিবাদ-ফ্যাসিবাদ বলে যাঁরা সারাক্ষণ চিৎকার করেন, তাঁরা বলেন, ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভারতে। একজন ছাত্রীকে ঘিরে ধরে এতজন ছাত্র স্লোগান দিচ্ছে, এটা মানা যায় নাকি! এ দেশে নারী সুরক্ষা নেই, এ দেশে মেয়েদের পড়াশোনার অধিকার নেই, এ দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা বলে তো কিছুই নেই! নিপাত যাক নিপাত যাক, ফ্যাসি-মোদী নিপাত যাক।

ছবি-২ : কর্ণাটকে হিজাব-বিরোধী আন্দোলনে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়ছিলেন বছর ছাব্বিশের তরতাজা ছেলে হর্ষ। তাঁকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হলো। প্রথমে গাড়ির ধাক্কা। তারপরে জখম হর্ষকে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুন।

ফলাফল : অসহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতা, ফ্যাসিবাদ-ফ্যাসিবাদ বলে যাঁরা সারাক্ষণ চিৎকার করেন, তাঁরা হঠাৎ বোবা-কালা। কেউ কিছু দেখতেও পাননি, কেউ কিছু শুনছেনও না। হিজাব নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তাতে শুরুতেই হিন্দুদের গোঁড়া ও অসহিষ্ণু বলে এঁরা দাগিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন এঁরা করে থাকেন অন্য যে কোনও সাম্প্রদায়িক বিতর্কেই। কিন্তু এই বিতর্কে কোনও মুসলমানের গায়ে হাত পড়েনি।

হর্ষ হত্যার বিচার চেয়ে প্রতিবাদ মিছিল।

একটা মিথ্যাকে বার বার বলো, বলতেই থাকো, বলতেই থাকো, দেখবে একদিন সবাই ওই মিথ্যাকেই সত্যি বলে মানতে শুরু করেছে। এই নাৎসি কৌশলকে হাতিয়ার করেই বামেরা এতদিন নিজেদের গায়ের কালি বিরোধী শিবিরের গায়ে ফেলে এসেছে।

বরং হিজাব মিছিলের পাশে দাঁড়িয়ে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান তোলায় এক হিন্দু যুবককে সম্মিলিত পাথর হামলার সামনে পড়তে দেখা গিয়েছে। তাতেও চরিতার্থ হয়নি আক্রোশ। বজরং দলের সক্রিয় কর্মী হর্ষকে ভয়াবহ হামলায় খুন করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু ভণ্ডরা এখন ঘটনার তাৎপর্য আর বুঝতে পারছেন না। হিজাবিদের তরফ থেকে আসা চরম অসহিষ্ণুতা বা ভয়ংকর ফ্যাসিবাদকে সম্ভবত বিপ্লবের দিকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া হিসেবেই দেখছেন এঁরা। তাই নিন্দা নৈব নৈব চ..., মনে মনে বরং পুলকিতই হচ্ছেন।

ছবি-৩ : আনিস খান নামে এক মুসলমান তরুণের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে। তাঁকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে কে বা কারা খুন করেছে। খুনিরা নাকি পুলিশের বেশে ছিল। কিন্তু আসল পুলিশ ছিল কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ফলাফল : গোটা পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল। সিপিএম পথে নেমে পড়েছে, নকশাল হাঙ্গামা শুরু করেছে, এসইউসিআই রাস্তায়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র একজোট, বিভিন্ন মুসলমান সংগঠন প্রচণ্ড রেগে গেছে। রাজধানীর বুকে পথ অবরোধ হচ্ছে, জেলায় জেলায় মিছিল হচ্ছে, মন্ত্রীদের ঘিরে একের পর এক বিক্ষোভের খবর আসছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল হয়ে উঠেছে। উতলা হয়ে উঠেছে মানে, সে রকমটা দেখানোর চেষ্টা চলছে আর কী! কার জন্য এত কিছু? যে মুসলমান তরুণের ফেসবুক দেওয়াল রাষ্ট্রবিরোধী এবং হিন্দুবিরোধী মন্তব্যে ঠাসা। ভারতীয় সংসদে পাশ হওয়া সিএএ আইনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে যে তরুণ এবং বলে বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে অত্যাচারিত হিন্দু-বৌদ্ধ- শিখ-জৈন- খ্রিস্টানকে সে ভারতে আশ্রয় পেতে দেবে না। যে প্রকাশ্যে লেখে, কাশ্মীর ভারতের নয়, কাশ্মীরকে ভারত উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছে। যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সগর্বে লেখে কোরানকে গোটা পৃথিবীর সংবিধান হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। যে হাতে মাইক পেলেই উদার ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ায়, কিন্তু ফেসবুকে লেখে— 'হিন্দুদের উপর ভরসা করা মুসলমানদের উচিত নয়।' যে কোনও মৃত্যুই বেদনাদায়ক। কারও অকালমৃত্যু বা এভাবে খুন হয়ে যাওয়া কিছুতেই কাম্য নয়। কী কারণে আনিশকে খুন হতে হয়েছে জানি না। কিন্তু কোনো কারণেই এভাবে আইন হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয়। তাই খুনিদের কঠোর শাস্তি হোক, আমিও চাই। কিন্তু তিনটি কথা বলতে চাই—

১. আনিশকে হঠাৎ মহান হিসেবে দেখার বা দেখানোর কোনও জায়গাই নেই। ছেলেটি অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক ছিল।

২. ভণ্ডরা ফের নিজেদের খল, কপট স্বভাব-চরিত্রটা সামনে এনে ফেলেছে।

৩. মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে হুমকি দেওয়া শুরু হয়েছে, তা কিছুতেই মেনে নেওয়া উচিত নয়। কখনও বিক্ষোভ সমাবেশের মঞ্চ থেকে, কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাষণ দিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজন হুমকি দিচ্ছে। বিষয়টা আসলে প্রকাশ্য ব্ল্যাকমেলিং। বরাবরের সুবিধাবাদী এবং নিকৃষ্ট চরিত্রের বামেরা সেই ব্ল্যাকমেলিং কৌশলকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে। ভাবছে হাতছাড়া হওয়া ভোটব্যাঙ্ক ফিরে পারে। একথা তো অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, স্বাধীনতার পরে এ রাজ্যে তোষণের রাজনীতি সিপিএমের হাত ধরেই এসেছে এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এটাই ছিল সিপিএমের দীর্ঘ নির্বাচনী সাফল্যের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি। তাই হারানো হাতিয়ার নতুন করে হাতানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে।

এই গোটা আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছেন যে, আসল ফ্যাসিবাদী বা আসল অসহিষ্ণু কারা। সেই বোধকে আরও চাঙ্গা করবে একটা তথ্য। যে হিটলার ও মুসোলিনিকে দক্ষিণপন্থী হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে ফ্যাসিবাদকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়, সেই হিটলার ও মুসোলিনি কিন্তু বামপন্থীই ছিলেন। হিটলারের দলের নাম ছিল ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জারমরান ওয়ার্কাস্ পার্টি। দলের নাম দেখেই বুঝতে পারছেন সোশ্যালিজম অর্থাৎ সমাজবাদ এবং ওয়ার্কার অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর নামে ওই দল গড়া হয়েছিল। আর মুসোলিনি একবার ইতালিতে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে হিটলারের সহায়তায় যখন দ্বিতীয়বার ইতালির সরকারের দখল নেন, তখন ইতালীয় নামকরণ করা হয়েছিল ইটালিয়ান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক। অর্থাৎ নাৎসিবাদ বা ফ্যাসিবাদের উদ্ভব তথাকথিত দক্ষিণপন্থা থেকে বা জাতীয়তাবাদ থেকে নয়। বাম শিবির থেকেই ওদের জন্ম। বামেরা কৌশলে ওই কালি প্রতিপক্ষের গায়ে লাগিয়ে দিতে চায়। এটাও নাৎসি কৌশল। হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবলস ওই কৌশলের জন্মদাতা। তিনি বলেছিলেন, একটা মিথ্যাকে বার বার বলো, বলতেই থাকো, বলতেই থাকো, দেখবে একদিন সবাই ওই মিথ্যাকেই সত্যি বলে মানতে শুরু করেছে।

এই নাৎসি কৌশলকে হাতিয়ার করেই বামেরা এতদিন নিজেদের গায়ের কালি বিরোধী শিবিরের গায়ে ফেলে এসেছে। কিন্তু এবার থেকে এসব বলতে এলে হিটলারের দলের নামটা ওদের মনে করিয়ে দেবেন। □

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস এখন অপ্রাসঙ্গিক

রঞ্জন কুমার দে

আসন্ন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে দেশ সরগরম, তবে সবার চোখ উত্তরপ্রদেশে। রাহুল গান্ধী তাঁর পারিবারিক আসন আমেথি থেকে পর্যুদস্ত হওয়ার পর থেকেই উত্তরপ্রদেশ রাজনীতিতে কংগ্রেস আরও অপ্রাসঙ্গিক, যদিও বোন প্রিয়াঙ্কা কয়েকবার ভোটের প্রাঙ্গণে ঢাল ধরলেও আখেরে কংগ্রেসের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেনি। উপরন্তু কংগ্রেসি পুরানো নেতাদের সেখান থেকে দলত্যাগে কংগ্রেস অস্তিত্ব সংকটে। কংগ্রেসের মতো করুণ অবস্থা বহেনজী মায়াবতীরও। উত্তরপ্রদেশের বিগত বেশকিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনায় অন্যান্য বিরোধীদের মতো বহুজন সমাজবাদী পার্টিকে তেমন প্রতিবাদমুখর দেখা যায়নি। নির্বাচন যতই সন্নিকটে ভোটের বাজারে এই দলের নিজেদের গ্রহণযোগ্যতার ততই বিলুপ্তি ঘটছে। বর্তমান রাজনীতির চরম শীর্ষে থাকা যোগীজীর প্রধান বিরোধী অখিলেশ যাদবকেই মানা হচ্ছে। যদিও হায়দরাবাদের কট্টর মুসলিম এক রাজনৈতিক পরিবার সংখ্যালঘু ভোটে ভাগ বসাতে উত্তরপ্রদেশ চষে বেড়াচ্ছে। অখিলেশ এদের গুরুত্ব দিতে একেবারে নারাজ। গত বিধানসভা এবং লোকসভার অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজবাদী পার্টি সাইকেলে আর কোনো জোটসঙ্গী শামিল করতে চায়নি। দিল্লির মসনদ লক্ষ্ণৌ হয়ে পার হতে হয় কিন্তু সেখানকার অলিগলিতে বিছানো রয়েছে জাতপাতের বিষাক্ত কাঁটা। বর্তমান পরিস্থিতিতে বৃহত্তর এই রাজ্যে বাবাজীকে (যোগী আদিত্যনাথ) অপ্রতিরোধ্য মানলেও বিরোধীরা বিশেষ করে কংগ্রেস, বিএসপি নিজেদের অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস-বিএসপি ক্ষমতার স্বাদ কয়েকবার ভোগ করলেও ৪০৩ বিশিষ্ট বিধানসভা আসনে যথাক্রমে মাত্র ৭ ও ১৭টি আসনে তারা বর্তমানে সীমাবদ্ধ। বস্তুত কংগ্রেসের মূল ভোটব্যাঙ্ক মুসলমানরা যে এখন অখিলেশের পুরো দখলে এবং অতিরিক্ত হায়দরাবাদের ওয়েসির তীক্ষ্ণ নজর। অন্যদিকে বহেনজীর ভোট মূলধন দলিত এবং ব্রাহ্মণ ভোট বিজেপির দখলে। কংগ্রেসের যুবরাজ আমেথি থেকে কেরলের ওয়ানাড়ে পাড়ি দিলেও বোন প্রিয়াঙ্কা ২০১৭ বিধানসভা, ২০১৯ লোকসভা থেকেই উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে বেশ সক্রিয়। তাঁকে দাদি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিচ্ছবি হিসেবে পেশ করলেও হাতে এখন পর্যন্ত তেমন সাফল্যের নাগাল পাওয়া যায়নি। বিগত কিছুদিন যাবৎ উত্তরপ্রদেশের দলিত কন্যার ধর্ষণকাণ্ড, লখিমপুরে মন্ত্রীপুত্রের কৃষকদের উপর গাড়িচাপা ইস্যুতে প্রিয়াঙ্কা রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছিলেন। এহেন পরিস্থিতিতে এখন কংগ্রেস মহিলা সশক্তিকরণের উদ্দেশে ৪০ শতাংশ আসনে মহিলাদের টিকিট বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২২-এর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ২৪-এর দিল্লির ভাগ্য নির্ধারণ করবে?

তারা লক্ষ্ণৌয়ে একটি 'মহিলা ঘোষণাপত্র'ও জারি করেছে। দীর্ঘ ৩২ বছরের বনবাসের শেষে ক্ষমতায় ফিরতে কংগ্রেস ঘোষণাপত্রে নারীদের সরকারি চাকরিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ, ফ্রি স্মার্টফোন, স্কুটি, গ্যাস সিলিন্ডার প্রভৃতি লোভনীয় অফার থাকলেও স্বভাবতই প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ এগুলোর একটিও তারা কংগ্রেসশাসিত রাজস্থান, ছত্তিসগর, পাঞ্জাবে কার্যকরী করেনি!

বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতীর কাছে এই নির্বাচন অস্তিত্ব রক্ষার। যোগী সরকারের দুর্গে আঘাত হানার চাইতে লালটুপির সঙ্গে আপাতত হাতির অহি-নকুল সম্পর্ক। অভিযোগ, মায়াবতী এবং তার পরিবারে আয়ের চেয়ে অধিক সম্পত্তি মামলায় ইডি, সিবিআইয়ের কবল থেকে সুরক্ষা কবচের স্বার্থে বিজেপির সঙ্গে গোপন আঁতাতে এবং বিএসপি এসপির সম্মুখ সমরে ভোট ভাগাভাগি। ২০০৭ সালের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের দৌলতে দলিত-ব্রাহ্মণ একতায় সহজে লক্ষ্ণৌর মসনদে বহেনজী আসীন হয়ে যান, কিন্তু পরবর্তীতে ২০১২, ২০১৭ সালে ক্রমশ হাতির আসন সংখ্যা মাত্র ১৭-র কোঠায় সীমিত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অনুমান করছেন এবারের বিধানসভায় মায়াবতীর অস্তিত্ব আরও সংকটে, কারণ দলিত অধ্যুষিত এই রাজনৈতিক দল এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র নিজেদের সাংবাদিক সম্মেলন, অফিসিয়াল টুইট এবং নামমাত্র কয়েকটি ব্রাহ্মণ সম্মেলনেই সীমাবদ্ধ। তদুপরি ভীম আর্মির চন্দ্রশেখর আজাদের রাজনৈতিক এন্ট্রি অবশ্যই দলিত ভোটে ফাটল সুনিশ্চিত। রাজ্যের ২১ শতাংশ দলিত ভোটব্যাঙ্কের সিংহভাগ ৫৫ শতাংশ জাট, বহুজন সমাজবাদী পার্টির 'কোর' ভোটব্যাঙ্ক কোনোদিনই তাদের মায়াতে মোহভঙ্গ হয়নি। বাকি ৪৫ শতাংশের পাশি, ধোবি, বাল্মীকিরা বর্তমানে বিজেপির দিকে ঝুঁকে আছে যেটাও একসময় বিএসপি-র পকেট ভোট ছিল। কিন্তু বিজেপি ২০১৩-এর মজফ্ফর নগরের দাঙ্গার পর জাট ভোটব্যাঙ্ক নিজেদের পালে তুলতে যথেষ্ট সাফল্য পায়, যার ফসল তারা ২০১৪, ১৭ ও ১৯-এর নির্বাচনে ঘরে তুলতে পেরেছে। উল্লেখ্য যে, গত বিধানসভা নির্বাচনেও তারা ১৩ জন জাট বিধায়ককে লক্ষ্ণৌতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তাছাড়া খাটিক, কনোজিয়া, কোল ও অন্যান্যরা সপা ও কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছে। প্রথম দু'দফার প্রার্থী তালিকায় মায়াবতী অখিলেশের মুসলিম প্রার্থীর বিরুদ্ধে মুসলিম প্রার্থী, দলিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলিত প্রার্থী দিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় বিজেপির পালে হাওয়া তুলতে চাইছেন।

মিশন ২০২২-এর লক্ষ্যে অখিলেশ কানপুর থেকে বিজয়রথের যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন। এই রথযাত্রা সপার শুভারম্ভ মানা হয়ে থাকে। অখিলেশের ক্রান্তি রথযাত্রা সপাকে বিজয়ের মুকুট পড়িয়ে দিয়েছিল। সপা পরম্পরাগত MY ফর্মূলা অর্থাৎ ২০ শতাংশ মুসলিম ও ১০ শতাংশ যাদব ভোটব্যাঙ্ককে পুঁজি করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টায় নেই, যদিও গত কয়েকটি নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের হোঁচটে তারা এখন সফ্ট হিন্দুত্ববাদের কার্ডও খেলছেন। পিতা মুলায়ম সিং যাদবের MY ফর্মুলাকে নতুনভাবে সংমিশ্রণ করে মহিলা (M) Youth (Y) করা হয়েছে। ইউপিতে জাতিগত সমীকরণে সবচাইতে এগিয়ে ওবিসি ভোটব্যাঙ্ক শতাংশে ৩০% প্রায়। বিজেপি তাঁদের ১৫ বছরের রাজনৈতিক বনবাস শেষে মূলত ওবিসিদের সৌজন্যে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিল। রাজ্যে ২০১৪ লোকসভা, ২০১৭ বিধানসভা এবং ২০১৯ লোকসভায় ভরাডুবির পর সপা বিজেপির ফর্মূলায় শরণাপন্ন। সপা শিবির হেভিওয়েট ওবিসি নেতা স্বামী প্রসাদ মৌর্যকে দলে ফিরিয়ে সম্ভবত খুব স্বস্তিতে, কিন্তু শাসক শিবির তাঁদের ট্রাম্প কার্ড খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ওবিসিদের মুখ হিসাবে উপস্থাপনা করছে। ২০১২ সালে ওবিসি সংরক্ষিত আসন ৮৬ টির মধ্যে ৫৮ টি সপার দখলে গিয়েছিল, ২০০৭ সালে বসপার দখলে ৬২টি এবং সবশেষে ২০১৭ সালে বিজেপির অনুকূলে ৭৮টি আসন এসেছিল, তাই সমীকরণ পরিষ্কার, যেকোনো দলের ক্ষমতার স্বাদে ফিরতে ওবিসি ভোট সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কতটুকু। সপা নেতৃত্ব হিন্দু আবেগে কিছুটা সাড়া জাগাতে রামমন্দির প্রসঙ্গ টেনে তারা ক্ষমতায় ফিরলে দ্রুত রামমন্দিরের কাজ পূর্ণ করার আশ্বাস দিচ্ছে, সঙ্গে এটাও স্বীকার করেছে মহামান্য আদালতের রামমন্দির সম্পর্কিত যেকোনো রায়দানে তারা অসম্মতি প্রকাশ করেনি। কিন্তু বিজেপি সেনাপতি অমিত শাহ এক জনসভায় সপার উদ্দেশে বলেন কেউ ভোলেনি ৯০-এর দশকে করসেবকদের কারা গুলি করে সরযূনদীর তীরে ভাসিয়ে দিয়েছিল, রামলালাকে কাদের জন্য এতোদিন তাঁবুতে থাকতে হয়েছিল। মোট ২০ শতাংশ রাজ্যের সংখ্যালঘুর পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, তরাই ক্ষেত্র এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশে ১৪৩টি আসনে তাদের প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। ৭০টি আসনের ২০-৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট, ৭৩ টি আসন যেখানে মুসলিমদের ৩০ শতাংশের অধিক ভোট। প্রায় তিন ডজন আসন এরকম যেখানে সংখ্যালঘু মুসলিম শুধু নিজের ক্ষমতায় জিতে আসতে পারে। ১০৭ টি বিধানসভা আসনের হার-জিতে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক হতে পারে। কৈরানা থেকে হিন্দু পলায়নের মুখ্য দোষীদের সপার অবাদে টিকিট বণ্টন অবশ্যই বৃহত্তর হিন্দুসমাজকে আরও প্রভাবিত করবে।

ইউপির ব্রাহ্মণ সমাজকে শিক্ষিত, অধিকতর জ্ঞানী এবং নীরব ভোটার মানা হয়, যাঁদের ১২-১৪ শতাংশ ভোট গত কয়েকটি বিধানসভায় যে দলের অনুকূলে এসেছিল তারাই ক্ষমতার স্বাদ নিয়েছিল। তাঁদের ভোটব্যাঙ্ক সর্বদা যেকোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি স্থির থাকে না। তাই নির্বাচনী প্রত্যেকটি মরসুমে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্রাহ্মণ সম্মেলনের অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন বিকাশ দুবে এনকাউন্টার সহ যোগী সরকারের কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ব্রাহ্মণসমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বিজেপি প্রাথমিকভাবে বিকাশ, সুরক্ষা, রাষ্ট্রবাদ এবং সুশাসন অ্যাজেন্ডাকে সামনে রেখে জনগণের ভোটের দুয়ারে, কিন্তু কিছু প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই রয়েছে। পশ্চিম উত্তর প্রদেশের ৩২ শতাংশ মুসলিম ভোট খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগীজী সম্ভবত ছেড়ে দিয়েছেন, সেখানকার বিজেপির দলিত জাট ভোট কৃষি কানুন, জাট সংরক্ষণ ইস্যুতে বিজেপির প্রতি মুখ ফিরিয়ে আছে। উত্তরপ্রদেশে ২০১৪, ২০১৭ ও ২০১৯ তে বিজেপির একটানা ঈর্ষণীয় সাফল্যে এতদিনে একটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াও তৈরি হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী এতদিনে ভারতবর্ষ জুড়ে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী ব্র্যান্ড হয়ে গেছেন, তিথি নক্ষত্র মেনে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলছেন। মানা যাচ্ছে উনিই আগামীদিনে মোদীজীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। বিজেপি আবার কল্যাণ সিংয়ের ১৯৯১-এর ফর্মুলায় ৬০ শতাংশ টিকিটে ওবিসি-দলিতদের জন্য বণ্টন করা হয়েছে। স্বভাবতই ২২-এর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন ২৪-এ দিল্লির ভাগ্য নির্ধারণ করবে নিঃসন্দেহে। □

বাঙ্গালি জাতিসত্তা ও ভাষা দুই-ই হারিয়ে ফেলছে

চারদিকে শুনছি মাতৃভাষার জয়ধ্বনি। তবুও বাঙ্গালি মাতৃভূমি ছেড়ে মাতৃভাষা ভুলে পালিয়ে এসে মুক্তি খোঁজে এদেশে। ভাষা দিবসে একটা কথা বারবার মনে হয় মোদের আশা, মোদের গর্ব, মোদের ভালোবাসা, তবুও বাঙ্গালি কেন আজ ভিটেমাটি ছাড়া? কেন আমাদের মধুর মাতৃভাষা বাংলা তার দুই সন্তান হিন্দু মুসলমানকে এক করে ধরে রাখতে পারে না সেদেশে? একটা ভাষা পরম ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে সযত্নে একটা জাতির জন্ম দিতে পারে, কিন্তু একটা উগ্র ধর্ম সেই পরম ভালোবাসা ভুলে তার জাতিসত্তাকে অস্বীকারও করতে পারে, এমন নজির কেবল সে নিজে। মনে সংশয় জাগে, ভাষা আন্দোলন, মুক্তি যুদ্ধ কোথাও কী সাম্প্রদায়িকতার বীজ লুকিয়ে ছিল? স্বাধীনতা, রক্ত, ভাষাদিবস, মুক্তিযুদ্ধ সব কেমন গোলমেলে লাগে। অনেক প্রবীণ নাগরিক আছেন যারা তিন দেশের নাগরিক, প্রথমে ছিলেন পাকিস্তানের নাগরিক, পরে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে বসবাস করছেন। তাদের চোখে মুখে ঝরে পড়ে শুধু একরাশ হতাশা। সোনার বাংলা ছারখার করে বিষাচ্ছে আজ ধর্মের বাতাসে। ভাষা নাড়ীর টানে বাংলাদেশ এক নয়, উগ্র ধর্মের মোহে এখন তারা এক হয়ে উঠতে চায়। রক্তে রাঙা অমর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তের দাগ লেগেছে হিন্দু মুসলমান দুইয়ের মধ্যে।

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় 'যদি তুমি নির্বাসন দাও, ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো, আমি বিষ পান করে মরে যাবো।' বাংলাদেশ থেকে প্রতিথযশা লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মতো অনেকেই আজ নির্বাসিত। নীলকণ্ঠ হয়ে মাকে ছেড়ে কেউ কখনো বাঁচতে পারে? কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল ভাগ হয়নি কো নজরুল।' কিন্তু কবির কথা কে শোনে? আমরা কখনো ভুলতে পারি না ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি, রফিক, সালাম, বরকত, আব্দুল জব্বার-সহ শহিদের কথা। আমরা কখনো ভুলতে পারি না 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশ একটা দেশ, একটা ভাষা কিন্তু তার ধর্ম ভুলে গেছে হিন্দু, মুসলমানের সহ-অবস্থানকে। আজ দূর দেশ বলে মনে হয়। ধর্মের বিষ ঢুকেছে এ বঙ্গেও।

বাঙ্গালির অস্তিত্ব আজ মহাসংকটে। একদিকে হারিয়ে গেছে তার মাতৃভূমি। অন্যদিকে সে কেটে দিতে চায় তার মাতৃভাষার নাড়ীর টানকে। সে ভুলে যেতে চায় তার মাতৃভাষাকে। 'মাতৃভাষা মাতৃ দুগ্ধের মতো' কে জানে! হয়তো কে পান করেছিল কবে! মধু ভাষা বাংলাও যেমন ধর্মের বিষকে নাশ করতে পারে না, তেমনি সে ভুলাতে পারে না দস্যু বণিকদের ভাষা ইংরেজির মোহও। এ বঙ্গের বাংলা ভাষার মতো রতন ছেড়ে বাঙ্গালি আজ ধন্য হতে চায় ইংরেজি শিখে। এখন তার না আছে দেশ, না আছে ভাষা। বাঙ্গালির কী ভাগ্য লিখন! জাতিসত্ত্বা হারিয়ে, ভাষা হারিয়ে ডুবন্ত নৌকার মতো সে আজ অস্তিত্বের মহাসংকটে।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

একদিন বাঙ্গালি ছিলাম রে

ফেব্রুয়ারি মাস বাংলা ভাষার মাস। একদা আমাদের ওপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। সেটা ষাটের দশক। বাঙ্গালি তা প্রতিহত করেছিল। তখন আমরা বাঙ্গালি ছিলাম বা বঙ্গবন্ধু আমাদের বাঙ্গালি বানাতে সচেষ্ট ছিলেন। তখনকার সময়ে মোনায়েম খাঁন বরিশাল বিএম কলেজে ছাত্রদের বলেছিলেন, 'তোমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা লিখতে পারো না'। ওই কলেজের একজন ছাত্র, যিনি পরে আমাদের সঙ্গে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন, তাঁর দাবি তিনি নিজে একথা শুনেছেন। কথাটা হুবহু ওরকম না হলেও মোনায়েম খাঁনের এমতো একটি বক্তব্য নানাভাবে তখন পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রচলিত ছিল। এটি সত্য ওই সময় 'রবীন্দ্র-বর্জন' এবং উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা চলছিল এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক ও জোরদার ছাত্র-যুব,, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল, ফলে আইয়ুব-মোনায়েমের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

এখনকার সময়ে বাংলাদেশে আরবি ভাষা-সংস্কৃতি ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। সবাই বাঙ্গালিত্ব ছেড়ে আরবীয় হবার চেষ্টা করছেন। উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে বাঙ্গালি গর্জে উঠলেও আরবি ভাষার বিরুদ্ধে কেন জানি চুপচাপ থাকতে পছন্দ করছেন। চলনে-বলনে, শিক্ষা-দীক্ষা বা পোশাক-আশাকে আরবীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ দেখে পুরানো ওই গানটি মনে হয়, 'একদিন বাঙ্গালি ছিলাম-রে'। পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙ্গালি মুসলমান বঙ্গবন্ধু'র নেতৃত্বে কিছুকালের জন্যে বাঙ্গালি হতে চেষ্টা করেছিল, এখন তাঁরা 'বাংলাদেশি' যা মূলত 'বাঙ্গালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ' বা আরও পরিষ্কার করে সংক্ষিপ্ত বললে, 'বাঙ্গালি মুসলমান' হচ্ছেন। তাই সঙ্গত কারণে সংবিধানের পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনী সবার পছন্দ। একই কারণে বাংলাদেশ নামক দেশটির আচরণ কেমন যেন প্রতিদিন হুবহু পাকিস্তানের মতো হয়ে যাচ্ছে, যা একুশের চেতনার পরিপন্থী।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমে; ভাষার পবিত্রতা বা অপবিত্রতা বলতে কিছু নেই? উর্দু ভাষার সামনে 'পবিত্র' শব্দটি ছিল না, তাই হয়তো আমরা উর্দুর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সক্ষম হয়েছিলাম। আরবি ভাষার সামনে 'পবিত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে, অনেকে তাই করছেন। তাই আরবীয় সংস্কৃতির জোয়ার ঠেকাতে কেউ ততটা আগ্রহী নন। তদুপরি আগে বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল, এখন গ্রামে-গঞ্জে 'ওয়াজ-মাহফিল' ছাড়া কিছু নেই। যাত্রাপালা, কবি গান, মেলা, গাজির পট সব হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। সংস্কৃতি এখন সীমিত এবং শহর কেন্দ্রিক। বিনোদন ক্ষেত্রে পাকিস্তান পিছিয়ে পড়ার সবগুলো কারণ বাংলাদেশে বিদ্যমান, সুতরাং—। শিল্প-সংস্কৃতি'র ক্ষেত্রে পাকিস্তান বা পুরো মুসলমান বিশ্ব পিছিয়ে, বাংলাদেশে এগিয়ে যাবার কোনো কারণ নেই। আমাদের শিল্পী-কলাকুশলীরা এজন্যে ভারতমুখী, এটি ক্রমশ বাড়বে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সবাই বলতেন, 'ঢাকা হবে বাঙ্গালি সংস্কৃতির

ফঃ ৩

পীঠস্থান'। এখন সঙ্গত কারণে কেউ ওকথা মুখেও আনে না। স্বাধীনতা ও মুক্তি দুটি শব্দ অনেকটা সমার্থক হলেও এক নয়। ভৌগোলিকভাবে স্বাধীন হলেও মুসলমান বিশ্ব মুক্ত নয়, বাংলাদেশ ধর্মীয় রাষ্ট্র না হলেও অবরুদ্ধ। বদ্ধ জলাশয় পচে যায়, অবরুদ্ধ সমাজে ভালো কিছু জন্মে না। এ বছর সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন একজন মুসলমান। তিনি লন্ডনে থাকেন। মুসলমানরা নিজেদের দেশে ভালো না করলেও অমুসলমান দেশে ভালো করছেন। কারণ, অমুসলমান দেশগুলো গণতান্ত্রিক এবং মুক্ত। আকাশের মতো উদার ও বাতাসের মতো মুক্ত না হলে 'সকলি গরল ভেল'। মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 'মুক্তি' কী জিনিস বোঝা কষ্ট। মানুষ সকল অবস্থাকে মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত, সবাই মানিয়ে নেয়! আরবি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ মেনে নেওয়ার এই ইচ্ছেটা আর যাই হোক 'বাঙ্গালিয়ানা' নয়!

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউইয়র্ক।

গণতন্ত্রে বিরোধী থাকা দরকার

ভারত বিশ্বের একটি গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে পরিচিত। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল রয়েছে। লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের ভোটারেরা তাঁদের পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন। জনগণের করের টাকায় নির্বাচন হয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পরে দেশের রাজনীতিতে একদল শাসন ক্ষমতায় থেকেছে আর অপর একটি দল বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে। তখনকার দলীয় নেতা নেতৃত্বের মধ্যে এখনকার মতো রেষারেষি ছিল না। যে দল ক্ষমতায় থেকেছে তারা বিরোধীদের সঙ্গে নিয়েই জনগণের উন্নয়ন করেছে। গণতন্ত্রে মানুষের অধিকার সংরক্ষিত করতে এবং সরকার পক্ষের একপেশে জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী দল থাকা দরকার। গণতন্ত্রের ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে শাসক দল বিরোধী দলকে যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছে না। এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা মিটিঙে বিরোধী দলকে ডাকছে না। এখন পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দল থেকেও তেমন কোনো ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। তার প্রধান কারণ বিরোধী দলের দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে অন্তর্কলহ ও নিজেদের মধ্য সমন্বয়ের অভাব। আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে বিরোধী শূন্য বোর্ড গঠনের জন্য ভোটের নামে যে প্রহসন হলো তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। গণতন্ত্রে বিরোধী দল না থাকলে সাধারণ মানুষের সমূহ ক্ষতি। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা ইচ্ছেমতো শাসন শোষণ করবে তার প্রতিবাদের কোনো লোক থাকবে না। সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। বিধানসভা ভোট পরবর্তীতে লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস আসন্ন পৌরসভা ভোটে প্রভাব ফেলবে। তাছাড়া বিরোধী দলের নেতা বা নেতৃত্ব ভোটের পর দলীয় কর্মীদের পাশে সেভাবেই দাঁড়ায়নি। এমনকী কোনো খোঁজ খবর রাখেননি। ভোটের পর ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের একে অপরের দোষারোপে নীচুতলার দলীয় কর্মীদের মনোবল আরও ভেঙে দিয়েছে। শাসকদলের একপেশে মনোভাব বিরোধী দলকে একেবারে অন্তর্কলহে লিপ্ত করে রেখেছে। যারা বিধানসভা ভোটে বিরোধী দলের অ্যান্টি হয়ে কাজ করলো তাদের হাতেই দল সংগঠনের রাশ দিয়েছে। এরা তো ভোটের আগেই শাসক দলের নেতা-নেতৃত্বের সঙ্গে সেটিঙে ছিল আর এরা কীভাবে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবেন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রে একটা কালোদিন নেমে আসতে চলেছে। পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা কোথাও কোনো বিরোধিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যারা বিরোধী দল করতে চায় তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তেমন কোনো নেতা দেখা যাচ্ছে না। ভালো-মন্দ যা কিছু হচ্ছে সাধারণ মানুষকে সবই মেনে নিতে হচ্ছে। যেটা গণতন্ত্রের পক্ষে কখনই শুভ নয়। রাজ্যে একটা বিরোধী শূন্য রাজনীতি চলেছে। বিরোধী দলের মেরুদণ্ড বিভিন্ন কেস দিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও একটা গোপন আতাঁত কাজ করছে। সাধারণ মানুষ কিছু হলেও বুঝতে পারছেন। কারণ তাদের নামে যে চোর-পুলিশ খেলা চলছে সেটা তার জ্বলন্ত নমুনা। যারা গরিব মানুষের টাকা আত্মসাৎ করলো তাদের কোনো শাস্তিই হলো না, উলটে সেটা এখন তুরুপের তাস হয়ে গেছে। ভোট এলেই ইডি, সি.বি.আই, তারপর আর কোনো কিছু হয় না। এটা রাজ্যের মানুষ আর পছন্দ করছেন না। গণতন্ত্রে তারা বিশ্বাস করেন যে, কোনো দল চিরদিন ক্ষমতায় থাকবে না। তাই আজ যারা বিরোধী আগামীদিনে শাসক দলের মর্যাদা পেতে পারেন। তাই মানুষ যে রায় দেবেন গণতন্ত্রে তা মাথা পেতে নিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। যারা বিরোধী দলের কর্মী তাদের সম্মান দিতে হবে। তবেই সুস্থ গণতন্ত্র ফিরবে। সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ও দাবি দাওয়াগুলো পাবে। তাই সাধারণ মানুষের অধিকার সুরক্ষিত করতে গণতন্ত্রে বিরোধী থাকা দরকার।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

অসৎদের শেষ ঠিকানা জেলখানা

বর্তমানে শাসক দলে থেকে কামিয়ে নেওয়া খুব সহজ। তাই ওখানে ভীষণ ভিড়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে ও ভিড় ছিল। সুবিধা হবে না বুঝেই দলত্যাগ। এসবের জন্য নীতি আদর্শের কোনো বালাই নেই। রাজনীতিতে নীতিহীন লোক কত তা বর্তমান শাসক দল তৃণমূল ও বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপিকে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। ছোটোবেলায় বিজ্ঞানে পড়েছিলাম কীভাবে বায়ুর ওজন প্রমাণ করা যায়। একটা পাত্র বায়ু সমেত ওজন করার পর ওই পাত্রের বায়ু বের করে ওজন করে, প্রথম ওজন থেকে পরের ওজন বাদ দিলেই বায়ুর ওজন পাওয়া যাবে। রাজনীতিতেও সৎ আদর্শবান কর্মী কত তা পরিমাপ করাও সহজ। ক্ষমতা থাকা কর্মীবর্গ আর শাসন ক্ষমতায় না থাকা কর্মীদের দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। জনগণ সবটা বোঝে। তাই আদর্শহীন দলত্যাগীদের বড়ো একটা অংশকে নির্বাচনে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে ভয় নেই, আইন আছে। অসৎদের শেষ ঠিকানা হলো কারাগার।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারী রোড, হাওড়া-৯।

নারী-পুরুষের সমানাধিকার
এখনও কথার কথা

অনামিকা দে

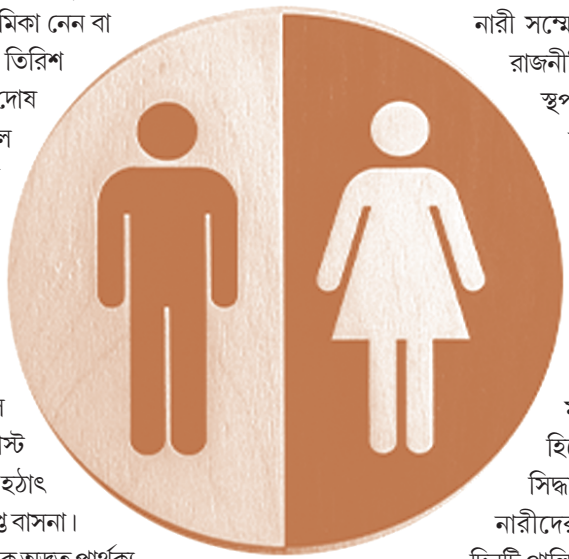

১৯ নভেম্বর আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস। পুরুষদের মধ্যে কতজন এই দিনটি উদ্‌যাপনে সক্রিয় ভূমিকা নেন বা এই দিনটি সম্পর্কে জানেন? অথচ প্রায় তিরিশ বছর আগে প্রথম পালিত হয় দিনটি। দোষ আপনার নয়, স্বয়ং গুগল বা সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাপগুলিও ইন্টারন্যাশনাল মেনস ডে পালন করে না। কিন্তু লক্ষ্য করুন প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় বেশ ঘটা করে। আমরা যারা নিজেদের সাধারণ মানুষ বলে চিহ্নিত করি তারাও বেশ গদগদ হয়ে উইমেনস ডে পালন করি। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের লেখা আর্টিক্যাল পোস্ট করে ভিড়ের মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, হঠাৎ করে বেরিয়ে আসে নারীবাদী হওয়ার সুপ্ত বাসনা। যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন দেখবেন, এক অদ্ভুত পার্থক্য রয়েছে মেনস ডে আর উইমেনস ডে উদ্‌যাপনের মধ্যে। উইকিপিডিয়ার স্টোরি অনুযায়ী নারী দিবস উদ্‌যাপনের প্রধান লক্ষ্য হলো নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন; কোথাও অবশ্য এটি পালিত হয় মহিলাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য।

অর্থাৎ ধরেই নেওয়া যায় যে নারীর প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা সম্মান যথাযথ নয়। সামাজিক বা আর্থিক ভাবেও তার প্রতিষ্ঠাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়, তাইতো তাকে ঘটা করে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে সম্মান জানানোর কথা বলতে হয়। অন্য দিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য হলো পুরুষদের অবদান ও ক্ষমতাকে উদ্‌যাপন করা। বিশেষ করে জাতি, সমাজ, সম্প্রদায়, পরিবার, বিবাহ এবং শিশুর যত্নে তাদের অবদানকে সেলিব্রেট করা। কী বিচিত্র আমাদের সমাজ! লিঙ্গ বৈষম্য ঘোচানোর দাবি জানানো মানুষরা হই হই করে বিশেষ 'ডে' পালন করেন, আবার সেই 'ডে' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বৈষম্যকেই প্রকট করেন। কথাটির অনুরণনে সমাজ সব সময়েই প্রভাবিত হয়েছে। একটি বিশেষ তারিখে প্রতীকী আন্দোলনের মাধ্যমে নারীজাতিকে আলাদা করে সম্মান জানিয়ে এই বৈষম্য ঘুচবে না কোনোদিন। জাগরণ চাই সমাজের নীচুতলা থেকে ওপর তলায়। জাগরণ চাই মানুষের মনে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। ভারতীয় নারী চিরকালই বিশ্ব দরবারে পূজিত। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের পারদর্শিতার নজির রেখেছেন। তাই আলাদা করে তাদের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে কোনো বাড়তি মর্যাদা নেই।

প্রকৃতরূপে নারী দিবস উদ্‌যাপনের মূলে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরি বৈষম্য, অনির্দিষ্ট কাজের সময়, কর্মক্ষেত্রে অমানবিক পরিবেশের প্রতিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতো কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে সরকারের লেঠেল বাহিনীর দমন পীড়ন চলে। ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বছর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সম-অধিকারের দাবি নিয়ে দিনটি পালিত হবে। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। এরপর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দিবসটি পালনে বিভিন্ন দেশকে আহ্বান জানায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এরপর থেকে পৃথিবী জুড়েই পালিত হচ্ছে দিনটি। নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠার অভীপ্সা নিয়ে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেশ এটিকে সরকারি ভাবে ছুটির দিন হিসেবে পালন করে। আবার বেশ কয়েকটি দেশে শুধুমাত্র নারীরাই সরকারি ছুটি উপভোগ করে।

সুতরাং লড়াইটা বাসে-ট্রেনে রিজার্ভ সিটের নয়, যোগ্যতা অনুযায়ী সমান অধিকারের। উদ্দেশ্য এটা নয় যে নারীর বেতন পুরুষ সহকর্মীর সমান হবে না কেন? উদ্দেশ্য এটা, নারীর বেতন তার যোগ্যতা অনুযায়ী হোক। সমাজের সকল স্তরেই যেখানে দক্ষতার সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত নারী, সেখানে অযাচিত বৈষম্যের স্বীকার হওয়া আধুনিক সমাজে অনভিপ্রেত। ▯

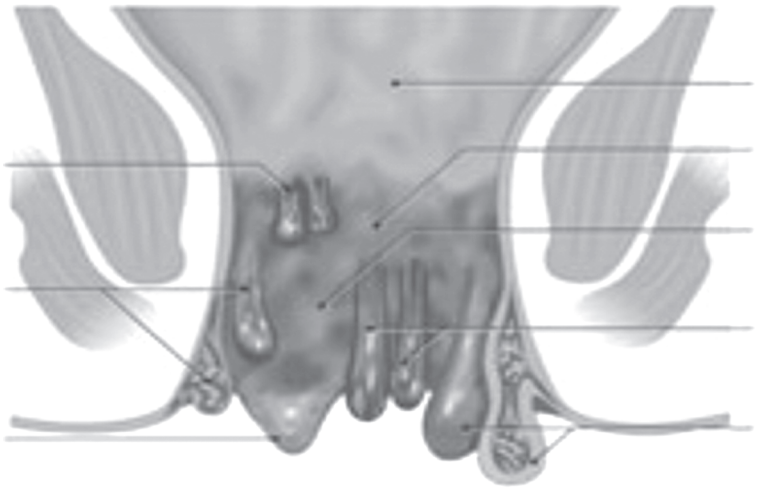

অর্শে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

রোগে অনেকেই ভোগেন। কিন্তু অর্শ রোগটি কী? মলদ্বারের শ্লৈষ্মিক স্তরের নীচের স্তরে এবং সরলান্ত্রের নিম্নস্তরের শিরাজালের নাম অর্শ। সংক্ষেপে বলা যায় অর্শ হলো সরলান্ত্রের অথবা মলদ্বারের শিরাস্ফীতি বিশেষ। রোগের অবস্থা অনুসারে অর্শকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে মলত্যাগের সময় মলদ্বারের এবং সরলান্ত্রের শিরাজালের স্ফীতি বাইরে বেরিয়ে আসে না। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাইরে বেরিয়ে আসে মলত্যাগের সময়। কিন্তু মলত্যাগের শেষে ভিতরে ঢুকে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তৃতীয় পর্যায়ে সবসময় বাইরে বেরিয়ে আসে। মলদ্বারের ঊর্ধ্বগামী অবাধ রক্তস্রোত প্রতিহত হলে শিরায় রক্ত জমে ফুলে ওঠে।

অর্শ নানা কারণে হতে পারে। তবে অতি সাধারণ কারণ কোষ্ঠকাঠিন্য। অন্যান্য কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হৃৎপিণ্ডজনিত যেমন কনজেটিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর; যকৃৎজনিত যেমন সিরোসিস অব লিভার; গর্ভাবস্থায় সময়ে বেশ প্রতিনিয়ত দাঁড়িয়ে কাজ করা; শিরা প্রাচীরের জন্মগত দুর্বলতা পারিবারিক ইতিহাস প্রভৃতি এসব কারণে শিরা প্রাচীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক সংকোচন হয় না। ক্রমে সেটা একটি থলির মতো স্ফীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অর্বুদের মতো সরলান্ত্রের মধ্যে থেকে যায় অথবা মলদ্বারের কাছে ঝুলে পড়ে। অর্শ মটরদানার মতো ছোটো অথবা ব আখরোটের মতো বড়ো হতে পারে এবং সংখ্যায় এক বা একাধিক থাকতে পারে। মলদ্বারের বাইরে আঙুরগুচ্ছের মতো অর্শ ঝুলতে দেখা যায়। অনেকের লক্ষণ ভেদে এই রোগের স্তর তিনটি। প্রথম স্তরে মলত্যাগের সময় টাটকা রক্তস্রাব হয়। দ্বিতীয় স্তরের রক্তস্রাব হয় বেশিমাত্রায়, মলত্যাগকালে মাংসতুল্য স্ফীতি মলদ্বারের চারপাশে দেখা যায়। যন্ত্রণা থাকে না, থাকলেও তা সামান্য। তৃতীয় স্তরে রক্তস্রাব হয় না, হলে সামান্য, কিন্তু থাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। মলদ্বারের চারপাশে সবসময় স্ফীতি লক্ষ্য করা যায়। অর্শের রক্ত মলের সঙ্গে মিশে থাকে। আবার বিন্দু বিন্দু বা পিচকারির মতো স্রাব হয়। অর্শের পরিণতি নানাভাবে হতে পারে— রক্তাল্পতা, পচন, ভগন্দর, শিরা থ্রম্বোসিস মূল এবং মলদ্বারের বাইরে অর্শ নির্গমন ও স্ট্র্যাঙ্গোলেশন।

রোগের পরিণতির কথা মনে রেখে সময়মতো চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক অবস্থায় নরম বিছানায় রোগী চিৎ হয়ে শয়ন করবে এবং নিতম্বের নীচে বালিশ রেখে যতদূর সম্ভব উঁচু করে রাখতে হবে। যন্ত্রণার লাঘব হবে তাতে। অর্শ বাইরে নির্গত হলে তা প্রথমে ধুয়ে পরিষ্কার করে বরফের সেঁক দিয়ে তা খানিকটা সংকুচিত করে আঙুলের সাহায্যে ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে।

হোমিওপ্যাথি প্রসঙ্গে :

নাক্স-ভমিকা : অতিরিক্ত চা, কফি বা মদে আসক্ত। শারীরিক পরিশ্রম হয় না, ব্যথার বেগ থাকে, কিন্তু ব্যথা হয় না। প্রায় রক্ত পড়ে, মলদ্বার কুট কুট করে বা চুলকায় প্রভৃতি লক্ষণে।

হ্যামামেলিস : রক্তাংশ খুব ফলপ্রদ যদি প্রদাহ বর্তমান থাকে। সেই সঙ্গে থাকতে পারে টাটানি ব্যথা। রক্তস্বল্প বা রক্তহীন মলদ্বার জ্বালা করে বা চুলকায়, কোষ্ঠকাঠিন্য।

অ্যালো সক্রেটিনা : যন্ত্রণার উপশম ঠাণ্ডা জলে, অর্শ আঙুরের থোকার মতো দেখায়।

সালফার : পুরাতন অর্শ, মলদ্বারের হুল ফোটানো বেদনা জ্বালা, কুট কুট করা, সেই সঙ্গে জ্বালা হাতের তালুতে, ব্রহ্মতালুতে ও পায়ের তলাতে এইসব উপসর্গে।

পিওনিয়া : মলত্যাগের পরে ভীষণ যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় রোগী ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়। অর্শ ফোটা ফুলের মতো দেখায় প্রভৃতি লক্ষণে দেখা যেতে পারে।

কলিনসোনিয়া : মলদ্বারে অস্বস্তিবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য পেট ব্যথা, পেট সব সময় বায়ুতে পূর্ণ। বেশি রক্তস্রাব হওয়ার ক্ষেত্রে।

ইস্কুলাস হিপ : অর্শে রক্ত থাকে না বা অল্প থাকে। মলদ্বারে অস্বস্তিবোধ, মলত্যাগের পরে মলদ্বারে জ্বালা, রক্তহীন বা স্বল্পরক্ত, মলদ্বারে আগুনের পোড়ার মতো জ্বালা, গরম সেঁকে উপশম প্রভৃতি লক্ষণে দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

র‍্যাটানিহা : রক্তস্রাব অল্প, কিন্তু মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা, জ্বালার পরমুহূর্ত থেকে উত্তাপে উপশম প্রভৃতি লক্ষণে।

কার্ডয়াস মেরিনিয়াস : যকৃতের দোষজনিত অর্শে উপকারে আসে।

লাইরোপডিয়াম : যকৃতের দোষজনিত অর্শে যদি রোগের বৃদ্ধি ঘটে অপরাহ্নে, পেটে বায়ুর প্রকোপ থাকে এবং রোগী গরম ভাত খেতে ভালোবাসে।

সাইট্রিক অ্যাসিড : প্রচুর উজ্জ্বল রক্তস্রাব, খিটখিটে লক্ষণে। এরকম অসংখ্য ওষুধ আছে হোমিওশাস্ত্রে। লক্ষণ অনুযায়ী যে কোনও ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কখনওই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করেন। যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। □

নারীর সার্বিক উন্নয়নেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন

শ্রীনিখিল

আবহমানকাল ধরে মানব সভ্যতায় নারী সত্তার যে ভূমিকা, তার উদ্‌যাপন কেবলমাত্র একটি দিনেই সীমিত থাকতে পারে না। চিরকাল এই উপমহাদেশের মঙ্গলময়ী সব কিছুতে নারীত্ব আরোপ করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। আমরা নদীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করি। প্রকৃতিকে ভক্তি করি। যা কিছু মাতৃসত্তাময়, সবকিছুতেই শ্রদ্ধা অর্পণ করি। সৃজনশীল যত আধার রয়েছে আমাদের চারপাশে তা সবই মাতৃময়। শাশ্বত এই ধারণা আমাদের অস্থিমজ্জায় পরম্পরাগতভাবেই বহমান। তাই ৩৬৫ দিনের নির্দিষ্ট একটা দিনকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' বলে ধার্য করলেই ষোলোআনা পূর্ণ হয়ে যায়?

বৈদিক যুগে সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। তা সত্ত্বেও নারী স্বাধীনতায় এতটুকুও কৃপণ ছিলেন না তখনকার সমাজপতিরা। সে যুগে মেয়েদের পায়ে ধর্মীয় গোঁড়ামির শিকল পরানো হতো না। বরং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে স্ত্রীরাই স্বামীকে সহযোগিতা করতেন। সেখান থেকেই সহধর্মিণী কনসেপ্টটা এসেছে। সামরিক ক্ষেত্রেও অবাধ বিচরণ ছিল নারীদের। বেদে বিশপালা ও মুদ্‌গলানি নামে দুজন রণকুশলী নারীর নাম পাওয়া যায়। এঁরা ঘর-সংসার সামলানোর পাশাপাশি রণক্ষেত্রেও সমান পারদর্শী ছিলেন। তখনকার মেয়েরা স্বেচ্ছায় জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতেন। বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, মমতা প্রমুখ বিদুষী নারী শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের নজির রেখেছিলেন।

লোমশা, জুহু, পৌলমী ও কামায়নীর মতো ধর্ম বিশেষজ্ঞ নারীরা ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রও রচনা করেছেন। সে যুগে পণপ্রথা ছিল, তবে ব্যাপারটা ছিল উলটো। বরপক্ষ মেয়েপক্ষকে পণ দিত। পুরুষ অপেক্ষা নারীদের গুরুত্ব কতটা অপরিসীম তা বোঝাতেই তখনকার বিধান প্রণেতারা পদে পদে নারীকে সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

দেশ-কাল ও স্থান ভেদে বহু সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে। সামাজিক পরিমণ্ডলে বিবর্তন হয়েছে। পুরুষতন্ত্রকে আরও শক্তপোক্ত করতে নারীদের পিছনের সারিতে ঠেলে দেওয়ার প্রবণতাও দেখা দিয়েছিল। তবে ইদানীং নারী ক্ষমতায়নের পক্ষে সওয়াল উঠতে শুরু করেছে। নারীবাদীরাও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্বাধীনতার আগে অবিভক্ত বাঙ্গলার নারীরা যে ঘরবন্দি থাকতেন না তার উদাহরণ ভুরি ভুরি রয়েছে। শিক্ষার পরিসর ছাড়িয়ে সশস্ত্র থেকে অহিংস আন্দোলন— সর্বত্রই সমান কর্তৃত্ব ছিল বাঙ্গলার মেয়েদের। আজকের দিনেও 'নারী-পুরুষ সমান সমান' স্লোগান দিয়ে কার্যত আড়াল করার চেষ্টা চলছে নারী ক্ষমতায়নের দৈন্যদশা। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনে

ক্রমশ কোণঠাসা হয় বাঙ্গলার মেয়েরা। পালাবদলের পর ক্ষমতায় আসীন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আমলেও সেই 'অবহেলিত' পরিসংখ্যানে তেমন হেরফের হয়নি। নিত্যনতুন 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী', 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' প্রভৃতি প্রকল্পগুলির অবতারণা দর্শায় যে, বঙ্গনারীদের মানোন্নয়নে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। যে কারণে গালভরা প্রকল্প চালুর এমন তৎপরতা।

২০১১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের মহিলা জনসংখ্যা ৪.৫১ কোটি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মহিলা শিক্ষিতের হার ৭৬.২০ শতাংশ। স্ট্যাটিস্টিক অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী নারী শিক্ষায় সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। এর মধ্যে ১৮-২৩ বছর বয়সি শহুরে মেয়েদের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ১৩তম স্থানে রয়েছে।

নারী ও শিশুপাচারে সারা ভারতে শীর্ষস্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৫ সালে এই তথ্য প্রকাশ করে জাতীয় অপরাধ তথ্য ও পরিসংখ্যান দপ্তর। ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২০৬৪ জন নারী পাচার হয়েছিল। পরের বছর সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়, ৩৫৫৯। রাজ্যের প্রান্তিক জেলাগুলোয় চরম দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব এবং কর্মসংস্থানের অভাবের কারণেই নারী পাচারচক্রের এই রমরমা। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও এই পাচারচক্রের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না বাঙ্গলার বহু মেয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে বিবাহিতা কর্মজীবী মহিলাদের হার ২৮.৫ শতাংশ। সেই নিরিখে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১১তম। ভারতের নিরাপদতম মেট্রো শহর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, এরাজ্যে গত এক বছরে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। অথচ দেশজুড়ে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার কমেছে ৮.৩ শতাংশ। ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের উপর হিংসাত্মক ঘটনার পুলিশে লিপিবদ্ধ অভিযোগের সংখ্যা ছিল ২৮৬৫৯, যা ২০২০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬৪৩৯। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসার ঘটনায় যেভাবে মহিলারা আক্রান্ত হয়েছেন, তাতে রাজ্যের নারী নিরাপত্তায় প্রশাসনের অক্ষমতার ছবি আরও প্রকট হয়েছে। নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা এখনও চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে।

গার্হস্থ হিংসার পাশাপাশি নারী নির্যাতনও ঊর্ধ্বমুখি এরাজ্যে। ২০২০ সালের এপ্রিলে এই সংক্রান্ত মামলা লিপিবদ্ধ হয়েছে প্রায় ৪০০-র কাছাকাছি। সেইসব মামলার নিষ্পত্তি এখনও ঝুলে রয়েছে। এরাজ্যে নির্যাতিতার সুবিচার পাওয়া অনেকটাই সোনার হরিণ ধরার মতো। কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তার কথায়, শুধুমাত্র লোকলজ্জা আর ঠাঁই হারানোর ভয়ে বহু মহিলা এবং তার পরিবার নির্যাতন সহ্য করেও মুখ খুলতে চান না। এই সংখ্যাটা অভিযোগ লিপিবদ্ধ হওয়ার সংখ্যার কয়েকগুণ। থানায় যেটুকু অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয় তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। যারা বাড়ির বউকে পুড়িয়ে মারে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে, তারাই আবার ফি-বছর নারী দিবস পালনের স্ট্যাটাস দেয় সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়ালে।

এখনও এরাজ্যের বিবাহিতা মেয়েদের বাপের বাড়ির সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিছুদিন আগেও চুঁচুড়ার এক পাড়াতুতো দিদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর তার দুই দাদা যাবতীয় সম্পত্তি দুভাগে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। যেহেতু অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই বাবার সম্পত্তিতে ভাগ চাওয়ার কোনো অধিকার তার নেই— এমনটা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে তার দুই দাদা।

পশ্চিমবঙ্গে এটাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও শ্বশুর, স্বামী, পুত্রের সম্পত্তিতে নাম নথিভুক্ত হয় না মেয়েদের। ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় রায় দিয়েছেন, হিন্দু সমাজে বাবার সম্পত্তির অধিকার ছেলেদের মতোই মেয়েদেরও

ঝুলন গোস্বামী

চাকদহের এক সাধারণ পরিবারের মেয়ে। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম প্রাক্তন স্তম্ভ। অধিনায়ক ঝুলনের ঝুলিতে রয়েছে ৩০০টি'র বেশি উইকেট। ২০০৭ সালে আইসিসি'র বর্ষসেরা মহিলা ক্রিকেটারের খেতাব পেয়েছেন তিনি। ৩৮ বছর বয়সি এই পেসারের ক্রিকেট কেরিয়ারে নানা বিশ্বরেকর্ড রয়েছে। এক টেস্টের দুই ইনিংসে দশ উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে তাঁর। নিজের পেস বোলিঙের দাপটে বিশ্বের তাবড় মহিলা ক্রিকেটারদের নাজেহাল করে ছেড়েছেন তিনি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক এক দিবসীয় ম্যাচে সর্বোচ্চ উইকেটের অধিকারী এই 'চাকদহ এক্সপ্রেস।' অর্জুন পুরস্কার, পদ্মশ্রী -সহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত তিনি। সম্প্রতি তাঁর জীবন অবলম্বনে বলিউডে তৈরি হচ্ছে বায়োপিক।

সমানভাবে থাকবে। কিন্তু বাস্তবে সামাজিক পরিসরে এই রায় তেমনভাবে লাগু হয় না।

নারী ক্ষমতায়নের প্রয়াসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলারা এরাজ্যে সর্বোচ্চ পদে আসীন রয়েছেন। স্বাধীনতার পর এরাজ্য প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে। যাবতীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এখন এরাজ্যে তাঁরই মুখাপেক্ষী। কলকাতা পুলিশের প্রথম মহিলা গোয়েন্দা প্রধান দময়ন্তী সেন, একাধিক গুরুত্বপূণ' পদে দায়িত্ব সামলেছেন। যদিও ২০১২ সালের পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডের তদন্ত করার সময় তাঁকে অপসারিত হতে হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের মেয়ে দেবশ্রী চৌধুরী লোকসভায় সাংসদ নির্বাচিত হয়ে নারী ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন। এছাড়াও অগণিত নারী, যারা বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার অলিন্দে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

এই বঙ্গে নারীসত্তার বিকাশের ধারা ধীরগামী। কোথাও কোথাও বাধাপ্রাপ্ত। এখনও নারীদের শুধুমাত্র ভোগের উপকরণ হিসাবেই দেখা হয়ে থাকে। মুসলিম সমাজে এই বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। তাদের পৃথক শরিয়ত আইন থাকায় ভারতীয় সংবিধানের বহু ধারা তাদের সমাজে প্রযোজ্য হয় না। নারী ক্ষমতায়নের গতি তরান্বিত হবে তখনই যখন লিঙ্গ পক্ষপাত বা 'জেন্ডার বায়াস' শব্দটি আমাদের সমাজ থেকে বিলুপ্ত হবে। নির্দিষ্ট দিনকে উপলক্ষ্য করে নারী সমাজকে গ্রন্থিতে বেঁধে ফেলার চেয়ে সামাজিক মনটাকে আরও উদার করা অনেক বেশি প্রয়োজন। প্রাচীন সভ্যতায় মানুষ নদীকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করতেন। তাই নদী ছিল নির্মল, স্বচ্ছ ও পুণ্যতোয়া। তার চারপাশ ছিল শস্য-শ্যামলা, উর্বর। সেই নদীকে কেন্দ্র করেই একের পর এক সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

এ যুগেও সেই সমৃদ্ধি সম্ভব। নারীকে কেন্দ্র করে সমাজের সার্বিক ক্ষমতায়ন হলে এরাজ্য তথা দেশ হবে বৈভবপূর্ণ।

একদা দিশাহীন আজ দিশারি

স্বামী সুকমল সাহার ছিল ছোট একটা মুদিখানা দোকান। সেই দোকানের স্বল্প আয়ে কোনোরকমে চলতো সংসার। পরে বাড়িতেই সেলাইয়ের কাজ করতে শুরু করেন বর্ণালি সাহা। স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসারে তিনিও সহযোগিতা করেন। এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে বর্ণালিদের জীবন ভালোই কাটছিল। তখনই নেমে এলো অন্ধকার। ছোট ছেলে সুগতম যখন ক্লাস ফাইভে পড়ে সেইসময় বর্ণালির স্বামী সুকমলের হৃদযন্ত্রের অসুখ ধরা পড়লো। ডাক্তার জানালেন রোগ নিরাময়ের একমাত্র পথ 'ওপেন হার্ট সার্জারি'। কিন্তু সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। টানাপোড়েনের সংসারে এত টাকা আসবে কোথা থেকে। পিছু হঠেননি বর্ণালি। সমস্ত জমানো টাকা এক করে স্বামীকে নিয়ে ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশে রওনা দিলেন। সেখানকার হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে ফিরলেন ময়নাগুড়িতে। কিন্তু সংসারে আয়ের উৎস মুদিখানা দোকানটাই তো বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। স্বামী ধীরে ধীরে সুস্থ হলেও তার ওষুধপত্রের খরচ কম নয়। তার উপর ছেলে- মেয়ের পড়াশোনার খরচ আছে। এছাড়া অন্যান্য খরচ খরচাও রয়েছে। এই অবস্থায় আবারও হাল ধরলেন লড়াকু বর্ণালি। মুদিখানা দোকানটা নিজেই চালাতে শুরু করলেন। পাশাপাশি চলতে থাকলো সেলাইয়ের কাজও। বর্ণালির হাড়ভাঙা পরিশ্রমে সংসারের হাল ফিরতে শুরু করলো। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনাও ঠিকঠাক চলতে থাকলো।

জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েও নিজের অতীতকে ভোলেননি বর্ণালি। সমাজে নির্যাতিত, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মেয়েদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর দিশা খুঁজে দেন আজও। বস্তি এলাকায়, বিভিন্ন সরকারি হোমে এমনকী দিব্যাঙ্গ মেয়েদের পাশেও অক্লান্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাদের প্রিয় 'দিদি'। গৃহবধূদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'সরোজিনী' নামে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। বর্ণালির এমন উদ্যোগের খবর পেয়ে একটি বহুজাতিক সংস্থা এগিয়ে এসেছে তাঁকে সাহায্য করার জন্য। ময়নাগুড়িতে একটি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে। সেখানে সপ্তাহান্তে প্রশিক্ষণ দেন বর্ণালি। বর্ণালির জীবনের আদর্শ তাঁর বাবা। তিনি বলেন, '' বাবা বলতেন, নিজেকে জলের মতো করে গড়ে তোলো। যেন সব পরিস্থিতির সঙ্গেই মানিয়ে নিতে পারো। বাইরের পোশাকি আবরণটা সব নয়। আসল হলো কর্ম। গান্ধীজী হাঁটুর উপর ধুতি পরতেন। তবু তাঁর কাজের মধ্যে দিয়েই তিনি নিজেকে মহাত্মা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন''।

জীবনে চলার পথে যখনই হতাশা এসেছে তখনই বাবার কথা স্মরণ করে এগিয়ে চলেছেন বর্ণালি। হার মানেননি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য মেয়েদেরও স্বনির্ভর হওয়ার দিশা দেখাচ্ছেন বর্ণালি সাহা।

স্বাতী চট্টোপাধ্যায়

সমাজের সব মেয়ের সার্বিক উন্নতি চাই : চন্দনা বাউড়ি

বাঁকুড়ার শালতোড়া বিধানসভার অতি সাধারণ পরিবারের গৃহবধূ চন্দনা আজ শালতোড়ার গর্ব। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে শ্রীমতী চন্দনা বাউড়ি এখন শালতোড়ার বিধায়ক। একচিলতে ঘর থেকে বিধানসভার পরিসর, সাধারণ মেয়ে থেকে বিধায়ক— অনেকটা রংপোলি পর্দার ছবির জীবনকাহিনি। চন্দনার সঙ্গে আলাপচারিতায় স্বস্তিকার প্রতিনিধি অনামিকা দে চন্দনার জীবনের চড়াই-উতরাই ও কিছু স্বপ্নের কথা জেনে এখানে সেটা তুলে ধরলেন।

— চন্দনাদি, বাঙ্গলার সাধারণ মেয়ের প্রতীক আপনি। আজকে একজন সফল নারী হয়ে এই সফলতাকে কীভাবে দেখছেন?

উঃ— নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করেছি। সেটাই আমার সফলতার চাবিকাঠি। প্রতিকূল পরিবেশ তো থাকবে, কিন্তু মনের জোর নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করলে সাফল্যকে ছোঁয়া অসম্ভব নয়।

— আপনার সাফল্যে আপনার পাশের মানুষদের কতটা সঙ্গে পেয়েছেন?

উঃ--- আমাকে আমার এলাকার সকলেই খুব ভালোবাসেন। প্রতিবেশীরা সবসময় আমাকে আমার পরিবারকে স্নেহের চোখে দেখেন। আমি ছাড়াও রয়েছেন স্বামী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ছেলেটি একেবারেই ছোটো। তাই ওকে মাঝে মাঝে সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে হয়। এবারেও ভোটের প্রচারে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম বেশ কয়েকদিন। আমার অনুপস্থিতিতে আমার শ্বাশুড়ি-মা সকলের দেখভাল করেন। পরিবারের প্রত্যেকের ভালোবাসাতেই তো আমি আজ এখানে পৌঁছতে পেরেছি।

— দিদি, রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রথম পদক্ষেপ কবে?

উঃ— ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য আমি বহুদিনের। তবে ২০১৬ সালে প্রথম দায়িত্ব পাই মণ্ডলের মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকার। পরবর্তীতে আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে মাদার বডিতে সম্পাদিকা হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। কাজের দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় সংসারের কাজকর্ম সেরে সকাল ৭টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তাম। আসলে আমাদের এলাকায় মহিলা কর্মী একসময় পাওয়াই যেত না। ভয়ে কেউ বেরোতো না। সেই সময় আমার পক্ষে লড়াইটা সত্যিই খুব কঠিন ছিল।

— রাজনীতি করতে গিয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে কখনো?

উঃ— ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যের প্রধান বিরোধী পক্ষ। তাই ক্ষমতাসীন দলের চাপ তো থাকবেই। তবে দলের কর্মীরা সকলে তীব্র প্রতিকূলতার সময়েও দলকে এবং আমাকে ভালোবেসে কাজ করেছে, সঙ্গে থেকেছে।

— বিধায়ক হিসাবে ও একজন সফল নারী হিসাবে আলাদা করে কি নারী সমাজের উন্নয়নের কথা ভাবছেন?

উঃ— হ্যাঁ, অবশ্যই একজন নারী হয়ে চাই আমার বিধানসভা এলাকার মেয়েদের সার্বিক উন্নতি। শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে। সে পথে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আমি আমার সাধ্যমতো সহযোগিতা করব।

নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সপরিবারে চন্দনা বাউড়ি।

— ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ভারতের মতো দেশে এর প্রাসঙ্গিকতা কতটা?

উঃ— আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের অবশ্য প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এর মধ্যমে মেয়েরা উৎসাহ পাবে। মহিলারা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে। আমরা সকলেই প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হই, তার মধ্যেও মনের জোর নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলেই জয় নিশ্চিত।

ভারতের মেয়েদের দিন বদলাতে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াস

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

সরকারের কাজ নীতি নির্ধারণ করা এবং সেই নীতি রূপায়ণ করার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করা। পরের ধাপে সরকার গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এই কাজে সাফল্য বা ব্যর্থতা দুইই আসতে পারে। কিন্তু সমস্যা তখন হয় যখন জরুরি কোনও ক্ষেত্র সরকারের ভাবনা থেকে বাদ পড়ে। এমনই একটি ক্ষেত্র হলো নারীর ক্ষমতায়ন। আমাদের দুর্ভাগ্য, নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কথাবার্তা অনেকদিন শুরু হলেও নরেন্দ্র মোদী ছাড়া ভারতের অন্য কোনও প্রধানমন্ত্রী গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেননি। বস্তুত, মেয়েদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো পাঁচশো টাকার প্যাকেজ না দিয়ে তিনি বরাবর তাদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আনার কথা ভেবেছেন। ক্ষমতাহীন ক্ষমতায়ন তত্ত্বের অসারতা তিনি বুঝেছেন বলেই শুরু

করেছেন সেখান থেকে ঠিক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে গ্রামগঞ্জের একজন সাধারণ মেয়ে 'মেয়ে হয়ে জন্মানোর' বিপদ মারাত্মক ভাবে টের পায়।

স্বচ্ছ ভারত মিশন

স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ প্রথম পর্বের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'মেয়েদের প্রয়োজন এবং নিরাপত্তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে স্বচ্ছ ভারতের প্রতিটি পর্যায়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।' পানীয় জল এবং নিকাশি ব্যবস্থা মন্ত্রকের নির্দেশিকাতেও বাড়িতে বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে মেয়েদের নিরাপত্তা এবং মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বচ্ছ ভারত মিশনের জন্য যে

মেয়েরা সমাজের সব ক্ষেত্রে সফল : মুনমুন সরকার

২০২১ থেকে আমি জলপাইগুড়ি জেলাতে টোটো চালাই। এর সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবামূলক কাজও করি। এখানকার বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধাদের পুজোর সময় টোটো করে নিয়ে যাই ঠাকুর দেখাতে। ২০২০ সালে যখন করোনা থাবা বসালো বিশ্বজুড়ে, আমাদের এখানেও জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার টোটো খুব কাজে এসেছিল তখন। টোটোটাকে অ্যাম্বুলেন্সের মতো ব্যবহার করেছি মানুষের সেবায়। বিনামূল্যে করোনা রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতাম। করোনা রোগীর বাড়ি স্যানিটাইজ করে দিতাম। সেসময় মানুষের মনে প্রচণ্ড ভয়। অনেক সময় সামাজিক বয়কটের শিকার হতে হয়েছে আমাকে। এখনও মানুষ নিজের বাচ্চাকে আমায় দিতে ভয় পায়, ভাবে পাছে আমার দ্বারা করোনা আক্রান্ত হয়।

আমার মনে হয় একটি বিশেষ দিনে নারী দিবস পালন না করে বছরের ৩৬৫ দিনই নারীদের সম্মান জানানো উচিত। নারীরা সকল পেশায় নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। আগামীতে নারীরা সমাজের সমস্ত স্তরে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবে। আমি মেয়েদের সব কাজে উৎসাহ দিই। আমার সংগঠন 'সদিচ্ছা ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে' মেয়েদের বিভিন্ন কাজের ট্রেনিং দিয়ে থাকি।

সাক্ষী গুহ

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা সাক্ষী গুহ 'বেঙ্গল লাভ কাফে' নামে একটি কাফেটোরিয়া চেইনের কর্ত্রী। একসময় চাকরি খুইয়ে জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো অনেকটা রুপোলি পর্দার মতো। একেবারে জিরো ইনভেস্টমেন্টে শুরু হয় তাঁর বেঙ্গলি লাভ কাফের জার্নি। সাক্ষীর নিজস্ব ভাবনায় গড়ে ওঠা এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি চালান শুধুমাত্র মহিলারাই। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মহিলারা এখানে এসে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জমি খুঁজে পান। এর পাশাপাশি সেবামূলক কাজেও নিজেকে উৎসর্গ করেছেন সাক্ষী। করোনা পর্বে লকডাউনের সময়ে অজস্র নিরন্ন পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে সাক্ষী গুহ'র বেঙ্গলি লাভ কাফে ফাউন্ডেশন।

সায়ন্তনী পুততুণ্ড

গড়িয়ার মেয়ে সায়ন্তনী পুততুণ্ড প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর লেখালেখির সখ। কবিতা ও গদ্য দুই বিষয়েই তিনি সমান পারদর্শী। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় একটি দৈনিক সংবাদপত্রের শনিবাসরীয় পাতায় প্রথম প্রকাশিত হয় সায়ন্তনীর ছোট গল্প 'চশমা'। গল্পটি পাঠক মহলে সমাদৃত হয় সেইসময়। বিভিন্ন সময় বাংলা দৈনিক পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত তাঁর লেখা প্রশংসা পেয়েছে। 'সর্বনাশিনী', 'চুপি চুপি আসছে', 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে' তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ্রন্থ।

কমিটি গড়া হয়েছে সেখানেও অগ্রাধিকার পেয়েছেন মহিলা সদস্যরা। এই প্রথম মহিলাদের প্রতি সমাজের অন্য সদস্যদের আচরণ স্থান পেল কোনও সরকারের নীতিতে। সারা দেশে খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্য পরিবেশ দূষণের প্রশ্ন যেমন ছিল, তেমনই ছিল মহিলাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি। এই অভ্যাস দূর করার জন্য প্রত্যেক বাড়িতে শৌচাগার থাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে গ্রামে গ্রামে তৈরি হয়েছে গ্রাম-জল-নিকাশি কমিটি। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এই কমিটির ৫০ শতাংশ সদস্য মহিলারাই। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী চাইছেন মেয়েদের সমস্যার সমাধান মেয়েরাই করুন। সরকারের কাজ শুধু পরিকাঠামো এবং অর্থ দিয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। নারীর ক্ষমতায়নের এর থেকে ভালো উদাহরণ আর কীই-বা হতে পারে!

মেয়েদের ভালো বোঝে মেয়েরাই

শুধু মেয়েদের উন্নতি নয়, মেয়েদের উদ্যোগে মেয়েদের উন্নতি— এমনই চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এই ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সাম্প্রতিক ক্যাবিনেট সম্প্রসারণে। মোট এগারোজন মহিলা স্থান পেয়েছেন ক্যাবিনেটে। একজন মহিলাকে আমরা প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে পেয়েছি নরেন্দ্র মোদীর আমলেই। সেনাবাহিনীর দরজা মহিলাদের জন্য খুলে দেওয়া মোদী সরকারের সিদ্ধান্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে তিন তালাক রদের কথা। তিন তালাক বৈধ না অবৈধ— এই নিয়ে যখন দেশজুড়ে বিতর্ক চলছিল তখন আদালতের নির্দেশে সরকার স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নামে। লক্ষাধিক মুসলমান মহিলা স্বাক্ষর করে তিন তালাকের উচ্ছেদের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে এই প্রথম মত প্রকাশের অধিকার পেয়েছিলেন মুসলমান মহিলারা। একে নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া আর কীই-বা বলা যেতে পারে? উলটোদিকে রয়েছে আদালতের সাম্প্রতিক একটি নির্দেশ। যেখানে বলা হয়েছে মৃত্যুর আগে বাবা উইল করে না গেলেও বিবাহিত/অবিবাহিত/বিধবা হিন্দু মেয়েরা পারিবারিক সম্পত্তির সমান অংশীদার হবেন।

'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের অংশ হিসেবে যাত্রা শুরু হয়েছিল সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার। এখনও পর্যন্ত তিন কোটি মহিলা এই যোজনার সুবিধা পেয়েছেন। সব থেকে বেশি উপকৃত উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক মহিলারা। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে মোদী জমানায় মহিলাদের উচ্চশিক্ষার হার বেড়ে হয়েছে ৪৩.৮২ শতাংশ। মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রেও মোদী সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। গ্রাম ও শহরের প্রায় আঠারো কোটি মহিলা ব্যাঙ্কিং ও নন-ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ক্ষেত্রে চাকরি পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অন্তর্গত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ শিবির থেকে ২০১৬ থেকে ২০২১-র মধ্যে যে ৭৩ লক্ষ প্রার্থী প্রশিক্ষিত হয়েছেন তার ৪০ শতাংশ মহিলা। মোদী সরকার সহৃদয়তার সঙ্গে চিন্তা করেছে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি। মাতৃত্বের সুবিধা (সংশোধনী) বিল, ২০১৭ এই বিষয়ে একটি মাইল ফলক। আগে চাকুরিরতা মহিলারা মাতৃত্বকালীন ছুটি পেতেন ১২ সপ্তাহ, এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৬ সপ্তাহ।

প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছেটি স্পষ্ট। তিনি মহিলাদের ক্ষমতার কেন্দ্রে দেখতে চান। তাদের মুখ থেকেই শুনতে চান, কী তাদের প্রয়োজন। মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করতে চান সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায়। সেই ইচ্ছে থেকেই তিনি নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁর চেষ্টা সফল হবে কিনা তা সময় বলবে। আপাতত বলা যায়, মেয়েদের প্রতি আন্তরিকতায় তিনি একশো শতাংশ সৎ। তাঁর চেষ্টাতেও কোনও ভেজাল নেই।

শ্রীধাম মায়াপুরে ধর্মজাগরণ সমন্বয় কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ

গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীধাম মায়াপুর, ইস্কন মন্দির পরিসরে প্রভুপাদ ভবনে ধর্মজাগরণ দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের দুই দিবসীয় অভ্যাস বর্গ সম্পন্ন হয়। ইস্কনের পূজ্যপাদ জগৎ আত্রিহা প্রভুর সুন্দর ব্যবস্থাপনায় বর্গ সুসম্পন্ন হয়। বর্গে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিধি, নিধি প্রমুখ রামপ্রসাদ মাহেশ্বরীজী, সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ প্রমুখ করুণা প্রকাশজী। এছাড়াও ছিলেন স্বামী সোমনাথ মহারাজ, স্বামী কুলদানন্দ মহারাজ, সাধিকা খনা মা, সঞ্জীব চক্রবর্তী প্রমুখ। বর্গে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৪ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদজী দক্ষিণবঙ্গের বর্তমান বিষম পরিস্থিতির বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কার্যকর্তাদের ধৈর্য ধরে সময় নিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী ধর্ম জাগরণ সমন্বয়ের কাজ করার সুচিন্তিত পরামর্শ দেন। সমাপ্তি পর্বে প্রভু জগৎ আত্রিহা তাঁর ওজস্বী বক্তব্যে সকলকে অনুপ্রেরণা দেন।

বিজয়গড় ও বাঁশদ্রোণীতে স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় ও বাঁশদ্রোণী সঙ্ঘ কার্যালয়ে স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুটি সম্মেলনেই প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন স্বস্তিকা পত্রিকার প্রকাশক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল (জয়ন্তদা)। মুখ্য বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সহ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। স্বস্তিকা পত্রিকা কেন পড়ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল। পরিশেষে পাঠকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন স্বস্তিকার প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল। দুটি সম্মেলনেরই ব্যবস্থাপনায় ছিলেন স্বস্তিকা প্রচার প্রতিনিধির স্থানীয় অভিভাবক অচিন্ত্য কুমার মণ্ডল।

বঙ্গ বিবেকের আয়োজনে সংবিধানের চিত্র পর্যালোচনা অনুষ্ঠান

বঙ্গ বিবেক দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ৭৭ নং আশুতোষ মুখার্জি রোডস্থিত আশুতোষ মেমোরিয়াল সভাকক্ষে ভারতের সংবিধানে নন্দলাল বসুর অসাধারণ কীর্তি বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের প্রদেশ সমিতির সদস্য সন্দীপ চক্রবর্তীর সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে সভা শুরু হয়। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। তিনি ভারতের সংবিধান গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এবং নন্দলাল বসুর অঙ্কিত চিত্রগুলি পর্যালোচনা করে হিন্দিতে 'হামারা সংবিধান ঃ ভাব এবং রেখাঙ্কন' শিরোনামে একটি পুস্তক লিখেছেন। প্রকাশক ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দিল্লি।

আলোচনা সভায় তিনি বলেন, সংবিধানে প্রতিটি পরিচ্ছেদে নন্দলাল বসুর অঙ্কিত চিত্রগুলি সেই পরিচ্ছেদের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তো বটেই, তাতে ভারতীয় নীতিবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধেরও প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন, রামরাজ্যের কল্পনা প্রসঙ্গে লঙ্কা বিজয়ের পর পুষ্পকরথে শ্রীরামচন্দ্র, মা সীতা, লক্ষ্মণ ও মহাবীর হনুমানের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের চিত্র অথবা মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের গীতা উপদেশ কিংবা তথাগত বুদ্ধ বা তীর্থঙ্কর মহাবীরের চিত্রগুলি সমগ্র ভারতাত্মাকেই প্রতিফলিত করেছে। সেজন্যই সংবিধান সভার লোগোতে অখণ্ড ভারতবর্ষের অঙ্কন করা হয়েছে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. বিশ্বপতি মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ-সব বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের প্রদেশ প্রমুখ অনুপম বেরা। জাতীয় সংগীত গেয়ে সভার সমাপ্তি হয়।

গৌড় সাংস্কৃতিক উত্থান ট্রাস্টের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ২০ ফেব্রুয়ারি মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে গৌড় সাংস্কৃতিক উত্থান ট্রাস্টের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ২৬ জন রক্ত দান করেন। এছাড়াও ৬০ জনের রক্তের শ্রেণী নির্ণয় করা হয়। শিবিরে উপস্থিত থেকে রক্তদানে উৎসাহিত করেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রামেশ্বর পাল, সম্পাদক প্রলয় কুমার দাস, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষ দাস, বিভাগ সেবা প্রমুখ দীপঙ্কর কমল বর্মা, উত্তরবঙ্গ সহ প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত, পূর্বতন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী কুমার সরকার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য প্রবীর কুমার মিত্র প্রমুখ।

মেদিনীপুরে বিজ্ঞান প্রচার মহোৎসব

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর শহরের মেদিনীপুর কলেজের বিবেকানন্দ হলে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান মহোৎসবের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রা-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। পরদিন ২৩ তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন সিনহা ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। তার আগে একজন বিশেষজ্ঞ হাতে-কলমে লেন্সের সাহায্যে মাইক্রোকোপ তৈরি করে দেখান। উল্লেখ্য, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে বিজ্ঞান প্রচার মহোৎসব অনুষ্ঠানের জন্য দেশের ৭৫টি স্থান নির্বাচিত হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর কলেজ নির্বাচিত হয়েছে।

সামতাবেড়ে শরৎভিটের সঙ্গে মদনগোপাল

মদনগোপাল বিগ্রহ।

দেবাশিস চৌধুরী

বাউনের ব্যাটা হয়ে ছোটোলোক ম্লেচ্ছদের সঙ্গে ওঠাবসা তৎকালীন পল্লীসমাজ মেনে নেয়নি। সমাজপতিদের রায়ে ধোপা- নাপিত বন্ধ হলো। বাউনের ব্যাটাকে বাধ্য করা হলো গ্রামের প্রান্তে ঘর বাঁধতে। ঈশ্বর বোধহয় এটাই চেয়েছিলেন, নিজের জীবনে দুঃখ নেমে না এলে দুঃখীর কথা সে লিখবে কী করে! দোয়াত-কালির শিল্পী অক্ষরের মোচড়ে গফুর মিয়ার চোখের জলের কথা কী করে খাতার শূন্য পৃষ্ঠাগুলিকে ভরিয়ে তুলবে? একদিক দিয়ে ভালোই হলো, পশ্চিমের লেখার ঘরের জানালার সামনে দিয়ে বয়ে চলা রূপনারায়ণকে সাক্ষী রেখে সৃষ্টি হতে থাকল একের পর এক কালজয়ী সাহিত্য। সাহিত্য রচনার সঙ্গে চলতে থাকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও। বেড়াভাঙা সামতার দালানকোঠায় প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে তৎকালীন কংগ্রেস দলের হাওড়া জেলা সভাপতির গড়ে উঠল আত্মিক সম্পর্ক। একদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পদধূলি যেমন পড়েছে অপরদিকে গুপ্ত বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল শরৎ-কোঠায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। হুগলীর ব্যান্ডেলের কাছে দেবানন্দপুর থেকে শুরু করে বিহারের ভাগলপুর হয়ে বার্মার রেঙ্গুন ছুঁয়ে হাওড়া জেলার পানিত্রাসের কাছে সামতাবেড়ে গ্রামে এসে শেষের সেদিনে সমাপ্ত হয়েছিল কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-পরিক্রমা।

একদিন শীতের সকালে পাড়ি দিলাম সামতাবেড়ের পানে। করোনাকালে পাব্লিক-ট্রান্সপোর্ট এড়িয়ে সরাসরি গাড়িতে যাওয়াই স্থির করলাম। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া- খড়্গপুর শাখার দেউলটি স্টেশনে নেমে শেয়ারে বা রিজার্ভে অটো- টোটোয় অনায়াসে যাতায়াত করা যায় এখানে। চাইলে সড়ক পথে বাসে মুম্বাই রোড ধরে এসে দেউলটি স্টপেজে নেমে অটো বা টোটো ধরেও সহজে আসা যায়। কলকাতার দিক থেকে এসে উলুবেড়িয়া, বাগনান পেরিয়ে দেউলটি পৌঁছে মুম্বাই রোড ছেড়ে আমাদের গাড়ি ছুটল ডানহাতি রাস্তায়। কিছুটা গিয়ে নিরালা রিসর্ট, দূরের যাত্রীরা চাইলে স্বচ্ছন্দে রাত্রিবাস করতে পারেন এখানে। রিসর্ট ছাড়িয়ে, কাটাখাল পেরিয়ে একটা মোড় থেকে এবার বাঁহাতি গলির রাস্তায় ঢুকলাম। মেন রাস্তাটি গেছে পানিত্রাসের দিকে। এই পানিত্রাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সেই সত্তরের দশক থেকে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে শরৎ মেলা। ওই সময় এলে মেলা একটা উপরি পাওনা।

গলিপথে সামান্য এগিয়ে রাস্তার ডানদিকে তাঁর বসতবাটি 'শরৎ স্মৃতি-মন্দির' আর বাঁদিকে রয়েছে সেই বিখ্যাত পুকুরটি, রামের সুমতির কার্তিক-গণেশ এই পুকুরেই খেলা করে বেড়াত। ইটের পাঁচিল ঘেরা বাড়িটির প্রবেশদ্বারের দুদিকে দুটি লেখা মন ছুঁয়ে গেল। বাঁধানো প্রবেশপথের ডাইনে মৃত পেয়ারাগাছটি আজও রামের সুমতির স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে। বাঁদিকে বাগানের ভিতর শরৎ-স্মতিতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে কথাশিল্পীর আবক্ষ মর্মরমূর্তি। দালানযুক্ত বাড়ির ঘরগুলি কড়ি বরগার হলেও দালানের ছাদ টালির হাওয়ায় একটা বেশ আটপৌরে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া রয়েছে সব জায়গায়। একতলায় পশ্চিমদিকের ঘরটিই ছিল শরৎচন্দ্রের লেখার ঘর। ঘরটিতে আজও তাঁর ব্যবহৃত চেয়ার টেবিল পরম যত্নে সাজানো রয়েছে। লেখার ঘরের পাশে দুটি ঘর। প্রথমটি ছিল বিপ্লবীদের গোপন শলাপরামর্শের কেন্দ্র। দ্বিতীয় ঘরটির ভিতরের দিকে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহে আজও নিত্যপূজা হয়ে চলেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তাঁকে উপহারস্বরূপ দেওয়া চরকা, তাঁর ব্যবহৃত গড়াগড়া, হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স, বইভর্তি কাঁচের আলমারি, ইজি চেয়ার সবই আছে— শুধু মানুষটাই নেই!

মদনগোপাল জীউ মন্দির

শরৎ স্মৃতি মন্দির

একতলা দেখে পুবের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এলাম। উপরের ঘরদুটির চারদিকেই টানা বারান্দা দিয়ে ঘেরা। এই ঘরদুটিও তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো। দক্ষিণের বারান্দা থেকে নীচের বাগান, প্রবেশপথ, রাস্তা পেরিয়ে পুকুর ছাড়িয়ে যতদূর নজর যায় পুরোটাই সবুজের কোলাজ। পশ্চিমের বারান্দা থেকে সময়ের তালে বেশ কিছুটা সরে যাওয়া রূপনারায়ণকে স্পষ্ট দেখা যায়। দেখা যায় ভ্রাতা ও দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী-সহ কথাশিল্পীর স্মারক-সমাধি। উত্তরদিকটি বাড়ির ভিতরের অংশ। বারান্দা থেকে রান্নাঘর, ধান রাখার মড়াই সবই পরিষ্কার দৃশ্যমান। নীচে নেমে বাগানের পাশ দিয়ে একটু গিয়েই ত্রয়ীর পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সমাধিস্থল। প্রথমে হিরণ্ময়ী দেবীর সমাধি, স্ত্রীর ঠিক পিছনেই কথাশিল্পী শুয়ে আছেন আর তাঁর পাশে বেলুড় মঠের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী বেদানন্দের সমাধি। আড়ম্বড়হীন ভাগগম্ভীর পরিবেশ। সেলফিপ্রেমী চটুল ভ্রমণার্থীদের ভিড় নেই এখানে। শরৎ স্মরণে একে একে স্মৃতির দরজায় কড়া নাড়ে গুফুর মিয়া থেকে রাজলক্ষ্মী। মহেশের কথা ভাবতে ভাবতে একসময় প্রস্থানের পথ ধরলাম।

শরৎ স্মৃতি-মন্দির থেকে বেরিয়ে টুকুসখানি হাঁটা পথে চলে এলাম রূপনারায়ণের পুবদিকের পাড়ে। এই নদী

কথাশিল্পীর ঘর

হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে ভাগ করেছে। বাঁদিকে কিছুটা গেলেই কোলাঘাট—পিকনিক পার্টির বেশ পছন্দের জায়গা। পিকনিকের আসর বসেছে এখানেও। ডানদিকে পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছে পিকনিক স্পট। ভেসে আসছে ডিজের শব্দ। রূপনারায়ণের কোলে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফেরার পথে পা বাড়ালাম।

গাড়িতে ফিরতি পথে কিছুটা গিয়ে কাটাখাল। এখান থেকে গাড়ি ডানদিকের ধুলো মাটির কাঁকুরে পথ পেরিয়ে উঠে পড়ল বাঁধের মাথায়। ডানদিক বাঁদিক করে পৌঁছে গেলাম মেল্লক গ্রামের মদনগোপাল জিউ মন্দিরের সামনে। চারশো বছরের পুরনো মন্দিরে আজও নিত্যপুজো হয়ে চলেছে রায়চৌধুরী পরিবারের হাত দিয়ে। কথা হচ্ছিল বর্তমান সেবাইত জয়ন্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে। তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ মুকুন্দ প্রসাদ রায়চৌধুরী আজ থেকে চারশো বছর আগে স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে খুঁজে পান মদনগোপালের এই অপরূপ কষ্টিপাথরের মূর্তিটি এবং ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে টেরাকোটা শিল্প-সমৃদ্ধ একটি আটচালা মন্দির স্থাপন করে শ্রীবিগ্রহটির প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে মোদনগোপালের মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা 'হেরিটেজ টেম্পল'-এর স্বীকৃতি পেয়েছে এবং আমূল সংস্কারের পর নব কলেবরে সেজে উঠেছে। প্রায় পাঁচফুট উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর ত্রি-খিলানযুক্ত মন্দিরের সামনে পাথরের ছোটো গরুড়মূর্তিটি এই মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ। গর্ভগৃহে মদনগোপালের সঙ্গে পূজিতা হচ্ছেন অষ্টধাতুর শ্রীরাধিকার মূর্তিটিও। স্থানীয় প্রবাদ বলে, প্রেমের দেবতা শরণাগতের জীবনে এনে দেন প্রেমের মধুরিমা, ভক্তকে মিলিয়ে দেন মনের মানুষের সঙ্গে। কথায় আছে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। জানি না প্রেম 'বস্তু' কিনা, তবে প্রেমের বাস্তবতাকে জীবনে উপলব্ধি না-করার মতো দুর্ভাগ্য আমার অন্তত হয়নি। আপনার জীবনের যদি এমন দুর্ভাগ্য ঘটে থাকে একবার আসবেন নাকি মেল্লকের মদনগোপালের দরবারে? ▯

ভারতবর্ষের যোগ এক অমূল্য দর্শন

প্রোজ্জ্বল মণ্ডল

যোগদর্শন হিন্দুদর্শনের এক অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচিয়তা মহর্ষি পতঞ্জলি। সেইজন্য একে পাতঞ্জল দর্শনও বলা হয়। এই গ্রন্থে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের বিস্তারিত বর্ণনা করে মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন।

যোগসাধনা ছাড়া কৈবল্য বা মোক্ষলাভ করা সম্ভব নয়। যোগদর্শন বলে— পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ভিন্ন আরও এক পুরুষ আছেন, যিনি অবিদ্যামূলক ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সহিত সম্পর্ক শূন্য, সেই পুরুষই ঈশ্বর। তিনি সকল জ্ঞানের আধার, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি অনন্ত, ত্রিকালাতীত, তাঁতেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। যোগসাধনার দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞান লাভই কৈবল্য বা মোক্ষলাভ। এটাই পাতঞ্জল দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ভাবে ঈশ্বরকে স্বীকার করায় যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—'যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধঃ।'— পতঞ্জল, ১২। অর্থাৎ যার দ্বারা বা যে উপায়ে চিত্তবৃত্তি রোধ করা যায় তাহারই নাম যোগ।

এখন চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি কী তা প্রথমে বোঝা প্রয়োজন। সাংখ্যে মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিনের আধারস্বরূপ চিত্ত। তমোগুণের আধিক্যবশত চিত্তের মূঢ়াবস্থা। রজোসত্ত্বাদির দ্বন্দ্বভাববশত চিত্তে কখনো স্থির কখনো অস্থির ভাব উপস্থিত হলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। পূর্ণ সত্ত্বগুণ লাভে চিত্তের একাগ্র অবস্থা। এই অবস্থায় মন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয়। একাগ্র অবস্থার পর চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ স্থির হলে তাকে চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা বলে। এই অবস্থায় মন সমাধিমগ্ন হয়।

চিত্তবৃত্তি বিরোধ কীভাবে হতে পারে? —এর উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, 'অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।' —পাতঞ্জল, ১।১২

অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। এই চিত্তবৃত্তির নিরোধের অপর নাম সমাধি। তা নানাপ্রকারে সিদ্ধ হয়ে থাকে। ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা সমাধি হয়। ঈশ্বরের বাচক বা প্রকাশক হচ্ছে প্রণব বা ওঙ্কার। এই ওঙ্কার জপের ও তাহার অর্থভাবনার সাহায্যে মন অন্তর্মুখী হয় এবং আত্মোপলব্ধির পথে সকল বাধা দূর হয়।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় দুই প্রকার— অভ্যাস ও বৈরাগ্য। চিত্তবৃত্তিগুলিকে সংযত করে মন স্থির করবার জন্য বার বার যে প্রচেষ্টা তার নাম অভ্যাস। দীর্ঘকাল আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে অভ্যাস সুদৃঢ় হয়। আর নিজের জন্য দৃষ্ট অথবা অপরের নিকট শ্রুতভোগ্য বিষয় সমূহের উপভোগ করবার যে তীব্র বাসনা বা ইচ্ছা তা পরিত্যাগ করার নাম হলো বৈরাগ্য বা বিষয়-বিতৃষ্ণা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে গীতায় বলেছেন— অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।। গীতা—৬।৩৫

অর্থাৎ হে অর্জুন, মন যে দুর্নিরোধ এবং অত্যন্ত চঞ্চল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাকে সংযত করা যায়।

চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করবার জন্য যোগদর্শনে যে সমস্ত সাধনার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা অষ্টাঙ্গ যোগ নামে পরিচিত। সেগুলি হলো— (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম,

(৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি।

(১) যম : অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ— এই পাঁচটিকে যম বলে।

'অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ'। —যোগদর্শন, ২।৩০

(২) নিয়ম পাঁচ প্রকার— শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

'শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ। —পাতঞ্জল, ১।৩২

(ক) স্নানাদি দ্বারা বাহ্য শরীরের শুচিতা এবং সচ্চিন্ত, সদ্ভাবনা দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা করাই হচ্ছে শৌচ।

'স্নানং মনোমলং ত্যাগং শৌচ মিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ'

অর্থাৎ মনের মলিনতা ত্যাগ করাই হচ্ছে যথার্থ স্নান এবং ইন্দ্রিয় সংযমই হলো যথার্থ শৌচ।

(খ) যথাযোগ্য চেষ্টা দ্বারা যা পাওয়া যায় তাতে তৃপ্ত থাকার নাম সন্তোষ। এর অর্থ দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা। সন্তোষ সিদ্ধ হলে অতি উত্তম সুখ লাভ হয়।

(গ) শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করা এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদির একান্ত সংযমের নাম তপস্যা। তপস্যার ফলে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়।

(ঘ) স্বাধ্যায়— ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রাদি পাঠ ও গুরুমন্ত্রাদি জপ করাকে স্বাধ্যায় বলে। স্বাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হলে ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হয়।

(ঙ) একান্ত শ্রদ্ধা ভক্তির সঙ্গে ভগবদচিন্তা এবং ঈশ্বরে সর্ব কর্ম সমর্পণ করে তাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাকে ঈশ্বর-প্রণিধান বলে। ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা যোগ-সাধনার চরম ফল সমাধি লাভ হয়।

(৩) **আসন :** যোগাভ্যাস কালে যে ভাবে শরীরকে স্থির করে দীর্ঘক্ষণ রাখলে কষ্ট বোধ হয় না, তাকে আসন বলে। স্থিরভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে এবং মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল সমরেখায় রেখে উপবেশন করতে হয়। একাসনে অন্তত ৩।৪ ঘণ্টা অনায়াসে বসবার অভ্যাস হলে আসনসিদ্ধি লাভ হয়। এই যোগ-সাধনার পক্ষে খুবই উপযোগী। আসন-সিদ্ধি হলে শীতোষ্ণাদি ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দ্বন্দ্বসকল আর বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না।

(৪) **প্রাণায়াম :** আসন সিদ্ধি হলে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়। শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম তিন প্রকার— পূরক, রেচক ও কুম্ভক। বাইরের বায়ুকে আকর্ষণ করে দেহের ভিতর পূরণ করাকে পূরক বলে। ভিতরের বায়ুকে বাইরে বের করে দেওয়াকে রেচক বলে এবং জলপূর্ণ কুম্ভের মতো দেহের অভ্যন্তরে বায়ুকে ধারণ করবার নাম কুম্ভক। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ু ও মন স্থির হয়। প্রাণায়াম সিদ্ধ হলে মোহাবরণ ক্ষয় হয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

(৫) **প্রত্যাহার :** ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় হতে প্রতিনিবৃত্ত করে চিত্তের অনুগামী করার নাম প্রত্যাহার। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক— এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ হতে প্রতিনিবৃত্ত হলে ইন্দ্রিয়গুলিও প্রতিনিবৃত্ত হয়ে চিত্তের অনুসরণ করে। প্রত্যাহারের তাৎপর্য হলো ,মনকে ইন্দ্রিয়গুলি থেকে বিযুক্ত করা। মন বিযুক্ত হলে চক্ষু খোলা থাকলেও বাহ্য বস্তু দেখতে পাওয়া যায় না, কান খোলা থাকলেও বাহ্য শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। প্রত্যাহার সাধনার দ্বারা এই অবস্থা যোগীর ইচ্ছাধীন হয়। চিত্তবৃত্তি-নিরোধের পক্ষে এই সাধনা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যাহার সাধনায় সিদ্ধি হলে ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার— এই পাঁচটিকে যোগের বহিরঙ্গ সাধনা বলে।

(৬) **ধারণা :** বাইরের বিষয় হতে প্রতিনিবৃত্ত করে কোনো এক বিশেষ স্থানে চিত্তকে স্থিরভাবে ধরে রাখার নাম ধারণা। এই স্থান নিজের দেহের ভিতরে কোনো কেন্দ্রবিন্দুতে অর্থাৎ নাসিকার অগ্রভাগে, হৃদপদ্মে অথবা বাইরের কোনো দেবতার মূর্তিতে হতে পারে।

যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা হয়, সেই বিষয়ে চিত্তবৃত্তির তৈলধারাবৎ একতানতা অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবনাকে ধ্যান বলে।

'ধ্যানং তৈল ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি সংতানররূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ' —ব্রহ্মপুত্র, রামানুজ ভাষ্য ১।১

'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্' —পাতঞ্জল, ৩।২

সাধারণত মন এক জায়গায় বেশিক্ষণ আবদ্ধ থাকে না, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়। সেই বিক্ষিপ্ত মনকে বার বার জোর করে ফিরিয়ে এনে ধ্যেয় বস্তুতে আবদ্ধ করতে হয়। সেরূপ অভ্যাসের ফলে মন যখন ধ্যেয় বস্তুতে অবিচ্ছিন্নভাবে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয় তখনই ধ্যান হয়। ধারণা যতই গাঢ় হয় ততই অন্তরে প্রবেশ করে, তখনই হয় ধ্যানের আরম্ভ। ধ্যান গাঢ় হলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় এবং অন্তরে এক গভীর প্রশান্তভাব জাগ্রত হয়।

(৮) **সমাধি :** যোগের অষ্টম অঙ্গ বা শেষ অঙ্গের নাম সমাধি। কোনো বিষয়ে দীর্ঘসময় ধ্যান করতে করতে মন যখন ধ্যেয় বস্তুর আকার ধারণ করে এবং তাতে লীন হয়ে যায়, তখন তাকে সমাধি বলে। ধ্যান গভীর হলে যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্র জ্ঞানগোচর থাকে এবং তদ্ভিন্ন অন্য সমগ্র বিষয়ের বিস্মৃতি ঘটে, তখনকার সেইরূপ চরম চিত্তস্থৈর্যের নাম সমাধি।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি— এই তিনটিকে যোগের অন্তরঙ্গ সাধন বলে। এই তিনটি একই বিষয়ে প্রযুক্ত হলে তাকে সংযম বলে।

জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যান— এটাই নির্বাণ মুক্তি। তখন সেই সিদ্ধ সমাহিত মহাপুরুষ লোককল্যাণের জন্য জগতে বিচরণ করেন এবং মুমুক্ষুকে মুক্তির পথে অগ্রসর হবার জন্য সাহায্য করেন। এরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ জগতে সত্যই খুব দুর্লভ। □

ভারতের পরিবার ব্যবস্থাই সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজগঠনের চাবিকাঠি

অসিত চক্রবর্তী

ভারতবর্ষ বিশ্বকে অনেক কিছুই দিয়েছে—বিজ্ঞান, চিকিৎসা- বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, যোগ ইত্যাদি। এর মধ্যে বিশ্বকে দেওয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদানের একটি হচ্ছে পরিবার ব্যবস্থা। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রাথমিক সংস্থা হচ্ছে পরিবার। যার উদ্ভব হয়েছিল ভারতেই। ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থায় এক-একটি পরিবার যেন স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। প্রতিটি পরিবারের মধ্যেই শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, পরিবেশ, অর্থ, বিচার ইত্যাদি সমস্ত বিভাগ পারস্পরিক ভারসাম্য রেখে পরিচালিত হচ্ছে।

ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আরেকটি কাজ পরিচালিত হয়, তা হলো পারিবারিক সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতিপালন, সংরক্ষণ ও বিকাশ। ভারতের পারিবারগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও তার বৈশিষ্ট্য এই যে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারা প্রতিটি ভারতীয় পরিবারে প্রবাহমান। উদাহরণস্বরূপ শুভকাজে শঙ্খধ্বনি, প্রদীপ প্রজ্বলন। ভারতের পরিবারগুলিতে তা পরিদৃষ্ট। উলুধ্বনি একটি স্থানীয় স্ত্রী-আচার। এসব আচার-সংস্কার-সংস্কৃতির প্রতিপালন পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রবহমান। তেমনি তুলসীগাছে জলদান, গোমাতার সেবা, মাতা-পিতার সেবা, অতিথি সেবা ইত্যাদি। এইসব শিক্ষার ব্যবস্থা একমাত্র পরিবার ব্যতিরেকে বর্তমানে আর কোথাও নেই। পরিবারে এসব পালিত হচ্ছে বলেই আজও পরিবার ব্যবস্থা সুসংগঠিত আছে, আবার ভারতীয় সংস্কৃতিও প্রাণবন্ত রয়েছে।

সকাল-সন্ধ্যায় পারিবারে সমবেত ভজন কীর্তন, সাধু-সন্তদের সেবা, বড়োদের শ্রদ্ধা ইত্যাদি আচরণে বাসভবন মঙ্গলময় হয়ে উঠে। ভারতীয় সংস্কৃতি পালিত হচ্ছে বলেই ভারতের পরিবারগুলি আনন্দময় ও সুখী। ঈশান দিকে গৃহ নির্মাণ, তারপর একসঙ্গে গৃহপ্রবেশ। গৃহ শব্দ থেকেই গৃহিণী, গৃহের তত্ত্বাবধান, দায়িত্বে থাকবেন তিনিই। মাতা-পিতার সঙ্গে সন্তানের বন্ধন, ভাই-বোনের বন্ধন, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন থাকে চির অটুট। পৃথিবীর আর কোথাও এরকম চিরস্থায়ী সুখী পরিবার দেখা যায় না। সাবিত্রীব্রত, শীতল ষষ্ঠীর ব্রত, ষট্ পূজা, ভাইফোঁটা ইত্যাদি অনুষ্ঠান ভারতের পরিবারগুলিতে পালিত হয়। তাই পরিবারগুলি সুসংগঠিত। সবার সঙ্গে সবার প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। তাই জীবনের শেষ দিনগুলি ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনির সাহচর্যে অতিবাহিত হয়। এহেন গৃহাশ্রম থাকলে বৃদ্ধাশ্রমের কথাই ওঠে না।

অনিয়ন্ত্রিত গ্লোবালাইজেশনের কুপ্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। পাশ্চাত্যের সস্তা স্বার্থপর ভোগবাদ ভারতের পরিবারগুলিতে ক্রমাগত আঘাত হানছে। ঘরের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে বাইরে ভাড়া করা বাড়িতে। জন্মদিন পালিত হচ্ছে বাতি নিভিয়ে। কেক কেটে। পয়লা বৈশাখ নয়, পয়লা জানুয়ারি হচ্ছে বর্ষ সেলিব্রেশন। ঘরে ঈশ্বর ভজন-কীর্তন করা হয় নিজেদের বদলে ভাড়াটে কীর্তনিয়াদের দিয়ে। অধিকাংশ কীর্তনিয়ার সুরে ঈশ্বরের ছবি চোখের সামনে আসে না, আসে ফিল্মের নায়ক নায়িকার ছবি। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়নের মতো পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিতে আত্মীয়-স্বজনেরা আজকাল ভাড়া করা বাড়িতে আসেন, সেখানেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে যান। নিমন্ত্রণকারী কাউকে গৃহে আমন্ত্রণ জানান না। সবার উপস্থিতিতে গৃহ যে আনন্দময় হয়ে ওঠে তা তারা ভাবতেই পারেন না।

অথচ পরিবার নামক সংস্থাটির সবকিছুর কেন্দ্র হলো গৃহ। এটাই একদিকে গার্হস্থ্য জীবনের মন্দির, অপরদিকে এটাই পরিবার ব্যবস্থার সচিবালয়। সমাজ ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক একক।

সুন্দর, সুসংগঠিত, সুসংস্কারিত পরিবার থেকেই তৈরি হয় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী বৈভবশালী রাষ্ট্র। পারিবারিক সংস্কার ও শিক্ষা একটি রাষ্ট্রকে স্বাভিমান ও শ্রেষ্ঠত্ব এনে দেয়। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনও সুখকর হয়। পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কার থেকেই ভারতের পথপ্রদর্শক ঋষি মুনিরা 'কৃন্বন্তু বিশ্বমার্যম্' মন্ত্রে ব্রতী হয়েছিলেন। সীতা, -সাবিত্রী- দময়ন্তীর মতো নারী; রামচন্দ্র লক্ষ্মণ-ভরতের মতো-ভাই; চৈতন্য বিবেকানন্দ শংকরদেব, শংকরাচার্যদের মতো মহাপুরুষ; বিদ্যাসাগর, অরবিন্দ, রামমোহনের মতো সমাজ সংস্কারকেরা ভারতের সংস্কারিত পরিবার থেকেই বেরিয়ে এসেছেন।

তাই পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে ভারতের পরিবার ব্যবস্থাকে মুক্ত রাখা একান্ত আবশ্যক। বর্তমান ভাঙনমুখী পরিবার এবং সামাজিক বন্ধন ও মূল্যবোধের অভাব ও বিকৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফলেই হচ্ছে। তাই যে কোনো মূল্যে ভারতের পরিবার ব্যবস্থাকে সুস্থ ও অক্ষত রাখা একান্ত আবশ্যক। পরিবার ব্যবস্থা সুসংগঠিত থাকলেই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

(লেখক দক্ষিণ অসম প্রান্ত কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ)

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক সরসঙ্ঘচালক রামকৃষ্ণ মিশনের এক সঙ্ঘাধ্যক্ষের নির্মিত

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী)-এর জন্মদিন ছিল ৬ ফেব্রুয়ারি। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী

অখণ্ডানন্দজী (১৮৬৪-১৯৩৭)-র মন্ত্রদীক্ষার প্রবল প্রভাব পড়েছিল নাগপুর কেন্দ্রিক মহারাষ্ট্রে। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। ১৯২৮ সালে স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দ (বিপ্রদাস মহারাজ)-কে ভুবনেশ্বর মিশন থেকে তুলে মঠাধ্যক্ষ করে পাঠানো হলো নাগপুরে। সেখানে তিনি নাগপুরবাসী বিশেষ করে ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ভাবধারা প্রচার করতে শুরু করলেন। ভাস্করেশ্বরানন্দজীর উদ্যোগে মরাঠি ভাষায় প্রকাশিত হলো মাসিক পত্রিকা 'জীবন বিকাশ'; সেই পত্রিকা সম্পাদনা করলেন মরাঠি যুবক সদাশিব থমব্রে। তিনিই স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রিয় 'Nagre', পরবর্তীকালে স্বামী ব্যোমরূপানন্দ, (১৯১০-১৯৯৯) ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত নাগপুর শাখার অধ্যক্ষ। ১৯৩৬ সালে নাগপুর মঠে মহাসমারোহে উৎযাপিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। ভাস্করেশ্বরানন্দজীর আগ্রহে থমব্রে এই ১৯৩৬ সালেই লিখেছিলেন মরাঠী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। তখন (১৯৩৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় মঠাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের দেহাবসানের পর মার্চ মাস থেকে) বেলুড়ের মঠাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ। মরাঠি ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী হাতে পেয়ে তিনি থমব্রেকে লিখেছিলেন (১৪ই মে, ১৯৩৫), "I hope many Marathi knowing people will be much benefitted by reading this short brochures. May Sri Ramakrishna shower his choicest blessings upon you."

স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দের মাধ্যমে বহু মরাঠি দেশপ্রেমী যুবক জানতে পারলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ ও মঠাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের নাম; জানলেন মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকরও। উচ্চশিক্ষিত

স্বামী অখণ্ডানন্দ ধীরে ধীরে মরাঠি দেশপ্রেমী ও মানবপ্রেমিক যুবকদের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন, আর সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে উঠলেন গোলওয়ালকর, পরবর্তীকালে যিনি হয়ে উঠবেন স্বয়ংসেবকদের 'শ্রীগুরুজী'।

গোলওয়ালকর সেই সুবাদে নাগপুর মিশনে নিয়মিত আসতে শুরু করলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল যুবক ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্যের (অমিতাভ মহারাজ, সন্ন্যাস নাম স্বামী অমূর্তানন্দ)। ইনি ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত সারগাছিতে স্বামী অখণ্ডানন্দের সেবক ছিলেন, ১৯২৭ সালে তিনি নাগপুর আশ্রমে যান। এই অমিতাভ মহারাজের কাছ থেকে গোলওয়ালকর জানতে পারলেন প্রচারবিমুখ এক অন্তর্মুখী সাধু তথা ঠাকুর-মা-স্বামীজীর অতি প্রিয়পাত্র

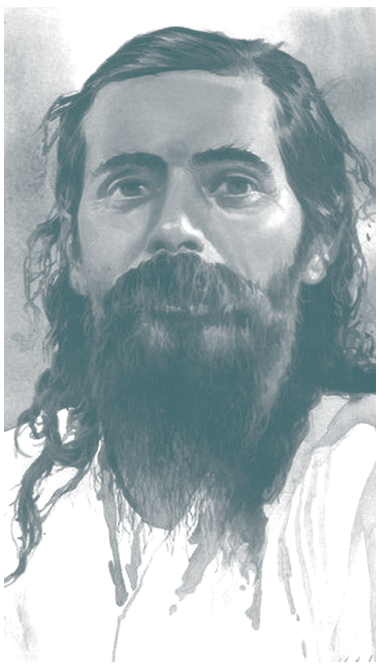

'গঙ্গাধর মহারাজ' (স্বামী অখণ্ডানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম) বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি গ্রামে অবস্থান করছেন এবং একনিষ্ঠ সেবাব্রতে নিরত আছেন।

১৯৩৬ সালে হিমালয় স্পর্শ করে এই অমিতাভ মহারাজের সঙ্গেই গোলওয়ালকর চললেন সারগাছির সেই পবিত্র গ্রামে। গোলওয়ালকর জেনেছেন, দেবতাত্মা

হিমালয়কে পরমেশ্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। মরাঠি যুবক রঘুবীর ধৌঙ্গরি, যিনি ১৯৩৪ সালে নাগপুরের ধন্তোলিতে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ আশ্রমের ছাত্রাবাসে ছিলন, তিনিও সারগাছি যাত্রায় গোলওয়ালকরের সঙ্গী হলেন। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এই তিন যুবক মিলে শিয়ালদহ হয়ে সারগাছি স্টেশনে নেমে পাকা ধানের ক্ষেত পেরিয়ে আশ্রমে হাজির হলেন। গোলওয়ালকর তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যবাহ, ইতোমধ্যে সফলভাবে সামলেছেন আকোলাতে অনুষ্ঠিত আধিকারিকদের জন্য প্রশিক্ষণ বর্গ। যেমন বক্তব্য তেমনই তাঁর লেখনী। আরও অনেক বড়ো দায়িত্ব গোলওয়ালকরকে দেবেন ভেবে রেখেছেন প্রথম সরসঙ্ঘচালক ডাক্তারজী। কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই বাড়ি থেকে পালিয়ে, ডাক্তারজীকেও না জানিয়ে গোলওয়ালকর ভিড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদরূপ এক মাস্তুলে, নোঙর ফেললেন সারগাছির পবিত্র আশ্রমে। ডাক্তারজী উদ্বিগ্ন। ২৩ জুনুয়ারি, ১৯৩৭ সালে একটি চিঠিতে নাগপুরের সদাশিব থমব্রেকে স্বামী অখণ্ডানন্দজী জানাচ্ছেন তাদের কুশল সংবাদ ''Raghuvir, Golwalkar, Amitav are all well here.''

মাধবরাও সদাশিব গোলওয়ালকর যখন সারগাছিতে পৌঁছেছেন তখন স্বামী অখণ্ডানন্দজীর বয়স প্রায় ৭২ বছর; প্রেসার, ডায়াবেটিস-সহ নানান শারীরিক সমস্যায় প্রায় শয্যাগত। সারাজীবন সেবা দিয়ে গেছেন, কারও কাছে সেবাযত্ন নিতে চাননি। স্বামী গম্ভীরানন্দজী তাই স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনীতে লিখেছেন, ''বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেও আজীবন স্বাধীনচেতা স্বামী অখণ্ডানন্দ দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকার কথা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতেন—তিনি অপরের সেবা করিবেন, সেবা লইবার অধিকার বা অভিপ্রায় তাঁহার নাই। অথচ বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা ও যুবক ভক্তদের আগ্রহ-নিবন্ধন তাঁহাকে শেষ বয়সে বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ সেবাগ্রহণ করিতেই হইত। আদর্শ ও বাস্তবের এই সংঘর্ষে তিনি ব্যথিতহৃদয়ে অনেক সময় বলিতেন, 'এইসব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমি নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকরূপে বিজন দেশে ঘুরে বেড়াব।''

গোলওয়ালকর (যিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে 'গুরুজী' নামে পরিচিত)-এর আন্তরিক ইচ্ছায় স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁর সেবা নিতে রাজি হলেন। শ্রীগুরুজীর জীবনীকার এইচ.ভি.শেষাদ্রি (Shri Guruji Glowakar–Biography by H. V. Sheshadri, April 18, 2011) লিখেছেন, ''Shri Guruji would daily bathe him, wash his clothes, offer him tea and meals, put him to bed. Often Shri Guruji would sit through the night at his bed-side and serve him. About six months passed in this manner.]'

স্বামী অখণ্ডানন্দ নিজে একটি চিঠিতে সম্ভবত গোলওয়ালকরের সেবাকর্মের উল্লেখ করেছেন, ''অমূল্য (স্বামী শঙ্করানন্দ, ১৮৮০—১৯৬২, রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সপ্তম অধ্যক্ষ) ৮ দিন Influenza-য় ভুগিয়া কয়দিন পথ্য পাইয়াছে। নাগপুর হইতে একটি ছেলে আসিয়া সকল রকমে তার কত সেবাই না করিতেছে।'' চিঠিটি স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছিলেন ১৩ অক্টোবর, সোমবার ১৯৩৬ সালে, প্রাপক ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে যিনি স্বামী নিরাময়ানন্দ (১৯১১-১৯৮৪) নামে পরিচিত হয়েছিলেন এবং উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক এবং মনসাদ্বীপ, চেরাপুঞ্জি, আসানসোল, যোগোদ্যান ও বোম্বাই মিশনের প্রধান হয়েছিলেন।

জানা যায়, বহু মরাঠি যুবককে স্বামী অখণ্ডানন্দজী পত্রে ও সাক্ষাতে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখতেন গোলওয়ালকর। স্বামী অখণ্ডানন্দ নাগপুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রয়োজনমতো নাগপুরের মরাঠি দেশপ্রেমী যুবকদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষতার পরামর্শ দিতে।

মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা নিবাসী বিনায়ক চেপ ছিলেন এমনই একজন যুবক, যিনি পরবর্তীকালে স্বামী অকামানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন (১৯৩৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর সারগাছিতে অখণ্ডানন্দের কাছে দীক্ষা, পরে স্বামী বিরজানন্দের কাছে সন্ন্যাস নেন; রাঁচী ও কানপুর মিশনের পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন; সম্প্রতি পরলোক গমন করেন)। এই মরাঠি বিনায়ককে স্বামী অখণ্ডানন্দ 'চাপরে' নামে ডাকতেন।

১৯৩৫ সালের ১৩ই আগস্ট একটি চিঠিতে তিনি চাপরে-কে লিখেছেন, ''I hope you are taking good care of your health. I can't understand at this distance why you don't have sound sleep. You will do well to consult Bhaskareswarananda. He will surely help you with his general instructions.... Don't meditate morning and evening too hard for sometime, till you are free from sleeplessness.''

স্বামী অখণ্ডানন্দ এইভাবে মরাঠি দেশপ্রেমী ও মানবপ্রেমিক যুবকদের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন, সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে উঠলেন গোলওয়ালকরের, পরবর্তীকালে যিনি হয়ে উঠবেন স্বয়ংসেবকদের 'শ্রীগুরুজী'। □

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

সংস্কৃতি-জগতের উজ্জ্বল দুই নক্ষত্র

রূপশ্রী দত্ত

ছায়াছবি ও নাট্যমঞ্চের এক উজ্জ্বল তারকা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে— কে.সি. দে নামেই যিনি সমধিক পরিচিত। তিনি একাধারে সংগীত পরিচালক, সুরস্রষ্টা, গায়ক, অভিনেতা ও সংগীত-শিক্ষক ছিলেন। তিনি শচীন দেববর্মণের প্রথম সংগীতগুরু ছিলেন। তাঁর পিতার নাম শিবচন্দ্র দে। খুবই পরিতাপের বিষয়, চোদ্দ বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিহীনতায় ভুগে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পদাবলী কীর্তনের গায়ক হিসেবেই সর্বাধিক স্মরণীয়। তিনি কলকাতার একাধিক সম্ভ্রান্ত পরিবারের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। শোভাবাজার রাজবাড়ি, বিডন স্ট্রিটের মিত্রবাড়ি প্রভৃতি বাড়িতে সংগীত পরিবেশনের জন্য নিমন্ত্রিত হতেন। তিনি প্রায় ৬০০ সংগীতের রেকর্ড করেছিলেন। বাংলা, হিন্দি ছাড়াও গুজরাটি ভাষায়ও গান গেয়েছেন। ১৯৩২ থেকে ৪৬ সাল সিনেমার জন্য গান তৈরি করে গেয়েছেন। তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য (১৯৫৩), 'প্রহ্লাদ (১৯৫২) 'দৃষ্টিদান' (১৯৪৮) উল্লেখযোগ্য। তিনি অন্ধগায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র দে, অরুন্ধতী দেবী

হিন্দি ছবি 'ইন্‌সান' (১৯৪৪) ও তমন্না-তে (১৯৪২), 'চাণক্য' ছবিতে অন্ধ ভিক্ষুক হয়েছিলেন। হিন্দি ছবি 'ধূপছাঁও'তে তিনি অন্ধগায়ক সুরদাসের ভূমিকায় ছিলেন।

গত শতাব্দীর তিনের দশক থেকে জনমানসে এমনই ছাপ ফেলেছিলেন যে, 'কে.সি.দের অভিনীত ছবিগুলির দর্শকমনে এক পৃথক আকর্ষণ থাকত। দর্শক শ্রোতার মনে 'অন্ধগায়ক' অভিধা তাঁকে এক শ্রদ্ধাপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিল। তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক ঘরোয়া আলোচনা সভায় তিনি 'কানাকেষ্ট' নামেও আন্তরিক বন্দিত হতেন। জনপ্রিয় গায়ক মান্না দে (প্রবোধচন্দ্র দে) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।

সংস্কৃতি জগতের আর এক নক্ষত্র হলেন অরুন্ধতী দেবী (১৯২৪-৯০)। পিতৃবংশের পদবি গুহঠাকুরতা। পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন। বিবাহবিচ্ছেদের পর আর এক বিখ্যাত চিত্র পরিচালক তপন সিংহকে বিয়ে করেন। তাঁদের পুত্রের নাম বিজ্ঞানী অনিন্দ্য সিংহ। অরুন্ধতী ছিলেন অভিনেত্রী, পরিচালিকা, লেখিকা ও গায়িকা। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের শিক্ষকতায় তিনি রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। ১৯৪০ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। অভিনয় শিল্পী হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাপ্রস্থানের পথে' (১৯৫২)। 'যাত্রিক' নামে এটি হিন্দিতেও নির্মিত হয়েছিল।

এছাড়া দেবকীকুমার বসুর 'নবজন্ম' (১৯৫৫), অসিত সেনের 'চলাচল' (১৯৫৩), এবং 'পঞ্চতপা' হয়েছিল অনতিকাল পরেই। 'বিচারক' (১৯৫৯), তপন সিংহের 'কালামাটি', 'ঝিন্দের বন্দি', 'জতুগৃহ'। 'ভগিনী নিবেদিতা'র জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান ১৯৬২-তে। তাঁর অভিনীত 'ছুটি' ছবিটিও পুরস্কৃত হয়েছিল।

অরুন্ধতী বরিশালে জন্মেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ তিনি অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'বিচারক' ছবির তিনি প্রযোজক ছিলেন। 'শশিবাবুর সংসার' ও 'দস্যু মোহন'-এও তিনি অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম তারকা বশিষ্ঠ মুনির স্ত্রী অরুন্ধতী। সংস্কৃতি জগতেরও অরুন্ধতী নাম্নী এই তারকা দর্শকদের মন জয় করেছিলেন। □

কোশীর সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পান বাসন্তী

।। **নিজস্ব প্রতিনিধি** ।। একটানা কুড়ি বছর ধরে উত্তরাখণ্ডের ৫০টি গ্রামে ঘুরে ঘুরে পরিবেশ রক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন এবং মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালিয়েছেন সমাজসেবী বাসন্তী দেবী।

উত্তরাখণ্ডের কোশী নদীর অববাহিকা অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দারুণ অনটনের মধ্যে জীবন কাটে। এখানকার মহিলাদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। জঙ্গলে জ্বালানীর কাঠ কেটে এবং মাঠে কাজ করেই তাদের সংসার চালাতে হতো। বাড়ির পুরুষেরা ছিল নেশায় অভ্যস্ত। নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাচ্ছিল। এগিয়ে এলেন বাসন্তী দেবী। তিনি মহিলাদের গাছ না কাটার অনুরোধ করলেন। তাদের বোঝালেন, গাছ ও ঝোপঝাড় কাটার জন্যই এই অঞ্চলে জলের স্তর ক্রমশ কমছে। যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে তীব্র জল সংকটে পড়তে হতে পারে। স্থানীয় মহিলারা বাসন্তী দেবীর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। তারা আর গাছ কাটলেন না। শুধুমাত্র জঙ্গলে পড়ে থাকা শুকনো কাঠ জোগাড় করে তাদের জীবন ধারণ চলতে থাকলো। ধীরে ধীরে আরো অনেক মহিলা বাসন্তী দেবীর পরিবেশ বাঁচাও কর্মসূচীতে অংশ নিল। সংগঠিত হলো বাসন্তী দেবীর নিজস্ব টিম।

সোমেশ্বরের কৌশানি থেকে কাটলি পর্যন্ত পঞ্চাশটি গ্রামে নিজের মহিলা সংগঠন বিস্তৃত করলেন বাসন্তী। কোশী নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং তার পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। রুখা-শুখা কোশী অববাহিকায় তাঁর সংগঠিত 'নারী শক্তি' ব্রিগেড একদিন বন দপ্তরের উদ্যোগে গাছকাটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো।

বাসন্তীদেবীর নিরলস প্রচেষ্টার ফল মিলল হাতে নাতে। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রায় শুকিয়ে যাওয়া জলাশয়গুলি ভরাট হয়ে উঠল। সোমেশ্বরবাসীরা ধানের বীজ রোপণ করল। কোশীর রুক্ষ ভূমি আজ সবুজে ভরে উঠেছে। কিন্তু বাসন্তীদেবী থেমে থাকেননি। এখনও সমাজসেবার সাধনায় মগ্ন হয়ে তিনি ছুটে যান তাঁর নারী সংগঠনের নানান কর্মসূচিতে। তাঁর কোশী বাঁচাও আন্দোলনের ফলে উত্তরাখণ্ডের মানুষের জীবনযাপনের নতুন গতি ত্বরান্বিত হয়েছে।

১৯৫৮ সালে পিথোরাগড়ের ডিগ্রা গ্রামে জন্ম বাসন্তীদেবীর। পঞ্চমশ্রেমীতে পড়ার সময়ই তাঁর বিয়ে হয়। ১৪ বছর বয়সেই বিধবা হন তিনি। আত্মীয়-স্বজনরা চেয়েছিলেন তাঁর আবার বিয়ে দিতে, কিন্তু সে পথে আর পা বাড়াননি তিনি। বাবার অনুপ্রেরণায় আবার পড়াশোনায় মন দিলেন।

ঘটনাচক্রে একদিন তিনি কৌশানির এক মহিলা আশ্রমে পৌঁছলেন। আশ্রমের অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক বৈষম্যমুক্ত পরিবেশ মুগ্ধ করল তাঁকে। আশ্রমে মহিলাদের মর্যাদা ছিল প্রশ্নাতীত। এই কারণে ওই আশ্রমেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। আলমোড়া জেলার বেলাদেবী ব্লকে বালবাড়ি যোজনায় যুক্ত করা হলো তাঁকে। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে শিশুদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র খোলা হলো। তাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হলো। এই সময়েই নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পূর্ণ করেন তিনি।

এরপরেই বাসন্তীদেবীর জীবনে এলো সোমেশ্বর পর্ব। এবার পরিবেশ রক্ষার ব্রত নিয়ে পাথুরে পথে ঘুরে বেড়ালেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ চল্লিশবছরের কর্মময় জীবনে প্রায় ২০০ টি গ্রামে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। ৫১ টি গ্রামের ১৫০ জন মহিলাকে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। তাই ২০০৮ সালে প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকা ধরে আমরা মহিলাদের স্বনির্ভর করার চেষ্টা করেছি।' বাসন্তীদেবীর এই অসাধ্য সাধনের ফলে পরবর্তীতে স্থানীয় পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্যও আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে।

সমাজে নারী শক্তির বিকাশের জন্য ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ 'নারীশক্তি' পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় বাসন্তীদেবীকে। ২০১৭ সালে ভূষিত হন 'ফেমিনা উওমেন জুরি' পুরস্কারে। 'কোশী বাঁচাও' আন্দোলনের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২২-এ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন।

নিজের জীবনের সঙ্গে কোশী নদীর অনেক মিল খুঁজে পান বাসন্তী দেবী। বলেন, ''একসময় চড়া পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছিল কোশী। অস্তিত্ব হারাবার মুখে দাঁড়িয়েও আবার সরস হয়েছে সে। আমার জীবনও অনেকটা তেমনই''। কর্মপথে চলতে গিয়ে বহুবার হতাশ হয়েছেন, কিন্তু পিছু হঠেননি 'কোশী কন্যা'। তাঁর কর্মজীবন, সেবাব্রত, নাছোড় মনোভাব আরো অনেক নারীর জীবনে আদর্শ হয়ে উঠেছে। ▯

ময়না, রাজকুমারী ও রাক্ষস

এক বনে এক ময়না থাকত। সে তার বাবা-মায়ের খুবই স্নেহের। যেমন মিষ্টি তার ব্যবহার, তেমনই মিষ্টি গলা। রোজ ভোরবেলা ময়না তার সুরেলা গলায় গান গেয়ে বনের সবার

ঘুম ভাঙাত। ময়নাকে বনের সবাই খুব স্নেহ করত। বনের রাজা সিংহ রোজ নিয়ম করে ময়নার গান শুনত। কিন্তু কাছেই পাহাড়ের ওপর থাকা এক জ্বালামুখী রাক্ষসের ভারী লোভ ছিল ময়না ওপর। সে বন্দি করে রাখতে চায় ময়নাকে।

একদিন বনের সবাইকে ডেকে সিংহ রাজা ঘোষণা করল— 'ময়না আমাদের গর্ব। ওর মতো মধুর কণ্ঠ এই ত্রিসীমানায় কারও নেই। তাই ময়নার গান গাইতে যেন কোনো অসুবিধে না হয় আর জ্বালামুখী তার কোনো ক্ষতি করতে না পারে, সেদিকে সবাই খেয়াল রাখবে।' সিংহরাজার নির্দেশ সবাই একবাক্যে মেনে নিল। ময়নার বাবা-মাও নিশ্চিন্ত হলো।

একদিন পাশের রাজ্যের রাজা সেই বনের পাশ দিয়ে যাবার সময় ময়নার মধুর কণ্ঠের গান শুনে থমকে দাঁড়ালেন। ময়নার গান শুনে রাজামশাই ভারী খুশি হলেন। সেপাই সান্ত্রীকে হুকুম দিলেন ময়নাটিকে যত্ন করে ধরে নিয়ে এস। রাজার আদেশ পেয়ে সেপাই সান্ত্রীরা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে ময়নাকে ধরে এনে রাজার হাতে দিল। রাজামশাই বললেন, শোনো ময়না, তোমার মতোই আমার একটি ছোট্টো মেয়ে আছে। কিন্তু সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। দাস-দাসী, গয়নাগাটি, আরাম-আয়েশ কিছুতেই তার মন নেই। তুমি যদি রাজকুমারীকে গান শুনিয়ে খুশি করতে পারো, তাহলে তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দেওয়া হবে। ময়না বলল, মহারাজ, সবাইকে গান শুনিয়েই আমি আনন্দ পাই। এই বনের কেউ যখন দুঃখে কাতর হয়, তখন আমি গান শুনিয়েই তার মনের কষ্ট দূর করি। অবশ্যই আমি রাজকুমারীকে গান শোনাব, তার মনের কষ্ট দূর করবো। তবে আমার একটি শর্ত আছে। মহারাজা বললেন, নির্ভয়ে বলো। ময়না বলল, মহারাজ, ওই পুবদিকের পাহাড়ের ওপর থাকে জ্বালামুখী রাক্ষস। সে ভারী বদমায়েশ। ওর জ্বালায় বনের সবাই একটুও শান্তিতে থাকতে পারে না। সিংহরাজার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে খাঁচায় পুরে রেখেছে ওই বদমায়েশ রাক্ষস। আর সেদিন হুমকি দিয়ে গেছে আমাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখবে। আমি রাজকুমারীকে খুশি করতে পারলে আপনাকে ওই রাক্ষসটাকে শায়েস্তা করতে হবে। যদি রাজি হন, তাহলে মা-বাবার কাছে অনুমতি নিয়ে আপনার রাজপ্রাসাদে যেতে রাজি আছি। রাজামশাই সম্মতি দিলেন। ময়না মা-বাবার অনুমতি নিয়ে রাজামশাইয়ের সঙ্গে উড়ে চলল।

সেখানে পৌঁছে ময়না চারিদিকে অবাক হয়ে দেখলো সোনায় মোড়া রাজপ্রাসাদ, লোকজন, দোকানপাট, রংবেরঙের সাজপোশাকের মানুষ। মহলের বারন্দায় সোনার দোলনায় ময়নার বসার জায়গা করা হলো। পরদিন ভোরবেলায় ময়না মধুর সুরে গান ধরল। অদ্ভুত ভালোলাগা মূর্ছনায় ভরে উঠল গোটা রাজপ্রাসাদ। ঘুমভেঙে গেল রাজকুমারীর। বিছানা ছেড়ে বারন্দায় এসে দেখল একটি ছোট্টো ময়না গান গাইছে। ভারী খুশি হলো রাজকুমারী। খিল খিল করে হেসে উঠে দাসীকে জিজেস করলল এই ময়না কোথা থেকে এল? কে আনল? রাজকুমারীর মুখে এত কথা শুনে দাসী আনন্দে রাজার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, মহারাজ, রাজকুমারী হাসছেন, কথা বলছেন। রাজা খুব খুশি হলেন। বুঝলেন এসব ময়নার গানের জন্যই সম্ভব হয়েছে। ময়না তার কথা রেখেছে। এবার রাজামশাইয়ের পালা।

রাজার চর এসে খবর দিল জ্বালামুখী রাক্ষস ভীষণ শক্তিশালী আর খুব অত্যাচারী। রাজামশাই সৈন্যসামন্ত, লোক-লশকর নিয়ে জ্বালামুখী রাক্ষসকে শায়েস্তা করতে চললেন। পাহাড়ে পৌঁছে রাক্ষসের সঙ্গে রাজার ভীষণ যুদ্ধ হলো। তিনদিনের যুদ্ধ শেষে হার মানল জ্বালামুখী। তারপর রাক্ষসকে বন্দি করা হলো। গুহার মধ্যে বন্দি থাকা সবাইকে মুক্ত করে দিলেন রাজামশাই। লোহার শিকলে বেঁধে রাক্ষসকে রাজার সামনে আনা হলে রাজামশাই তাকে বললেন, তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, কিন্তু তোমাকে এই তল্লাট ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর কোনো নিরীহ প্রাণীর ওপর অত্যাচার করা চলবে না। কাউকে খাঁচায় বন্দি করে রাখতে নেই। এই বলে রাজা জ্বালামুখীকে মুক্ত করে দিলেন। বন্দিরা খুশিমনে নিজের নিজের পরিবারে ফিরে গেল। রাজপ্রাসাদে ফিরে ময়নাকে সব বললেন রাজামশাই। ময়না বলল, মহারাজ, এবার আমাকেও ফিরে যাবার অনুমতি দিন। রাজকুমারীর মন কিন্তু চাইছিল না ময়নাকে ছেড়ে দিতে। রাজামশাই অনেক করে বোঝাতে রাজকুমারী রাজি হলো। ময়না বনে ফিরে যাবার আগে রাজকুমারীকে কথা দিল সে মাঝে মাঝে এসে রাজকুমারীকে গান শুনিয়ে যাবে।

@ নি চি

ভারতের বিপ্লবী

প্রভাস বল

বিপ্লবী প্রভাস চন্দ্র বলের জন্ম চট্টগ্রামের ধোরালায়। চট্টগ্রাম জে এম সেন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যুক্ত হন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে গুলির আঘাতে আহত হয়ে চারদিন পর ২২ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- ভারতের জাতীয় সংগীত বন্দে মাতরম্ ।
- ভারতের জাতীয় স্তোত্র জনগণমন।
- ভারতের জাতীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভ
- ভারতের জাতীয় নদী গঙ্গা।
- ভারতের জাতীয় জলজীব গঙ্গা ডলফিন।
- ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর।
- ভারতের জাতীয় বৃক্ষ বটগাছ।
- ভারতের জাতীয় ফুল পদ্ম।
- ভারতের জাতীয় ফল আম।
- ভারতের জাতীয় পশু বাঘ।
- ভারতের জাতীয় খেলা হকি।

ভালো কথা

শুদ্ধ মন

সকালে ও দুপুরে খাবার সময় হলেই আমাদের বাড়িতে ১০-১২টি কাক আসে। এসেই চিৎকার জুড়ে দেয় — কা কা। মানে আমাদের খিদে পেয়েছে, কিছু দাও। ঠাকুমা ওদের কথা বুঝতে পারেন। মাকে ডেকে বলেন, বউমা, ওদের কিছু খেতে দাও। মা কলতলায় রাখা সরাটার ওপর কিছু খাবার রাখলেই ওরা উড়ে এসে বসে সব খেয়ে চলে যায়। আবার দুপুরবেলা আসে। ওরাই কি না জানি না। ঠিক ১০-১২ টি। আমার ভাইয়ের বয়স পাঁচবছর। একদিন মা ওর হাতে খাবার ধরিয়ে দিয়ে সরাটায় রেখে আসতে বলেন। ভাই সরাটির কাছে যেতেই ওরা উড়ে এসে বসল। ভাইকে ভয়ই করল না। ভাইও আনন্দে ওদের মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। ঠাকুমা বললেন, ছোটোদের মন শুদ্ধ বলে ওরা ভয় পায় না। এখন থেকে ভাইয়ের হাতেই মা ওদের জন্য খাবার পাঠান।

পৃথা মণ্ডল, নবমশ্রেণী, পাকুয়াহাট, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) প্রা ন ন্ন শ	(১) ম ং সা গ গ স র
(২) য় ঔ ল য	(২) হী জ্ঞা অ র ক্ষ ন ন

২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) অকালমৃত্যু (২) চালচলন

২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) অকূলপাথার (২) অমৃতসাগর

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, মালদা। (২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯
(৩) শুভম সরকার, বেলঘড়িয়া, কল-৫৬। (৪) পূজা সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

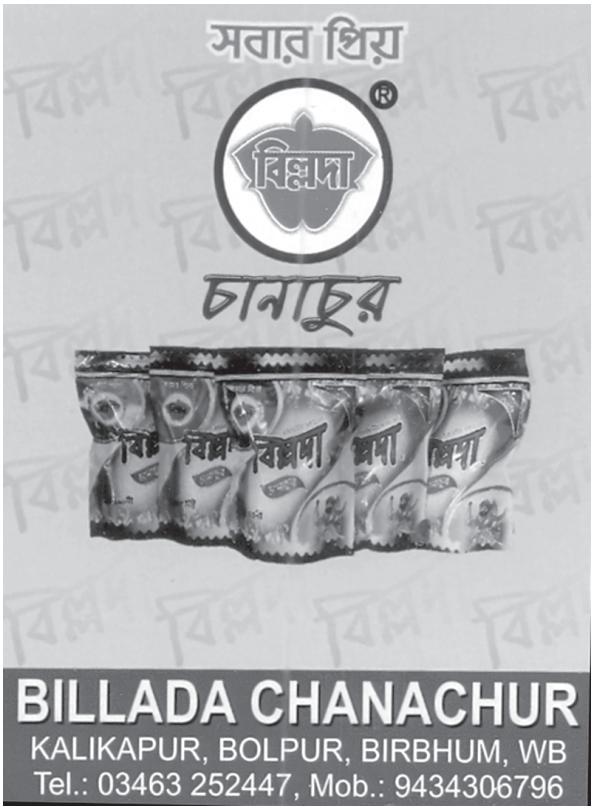

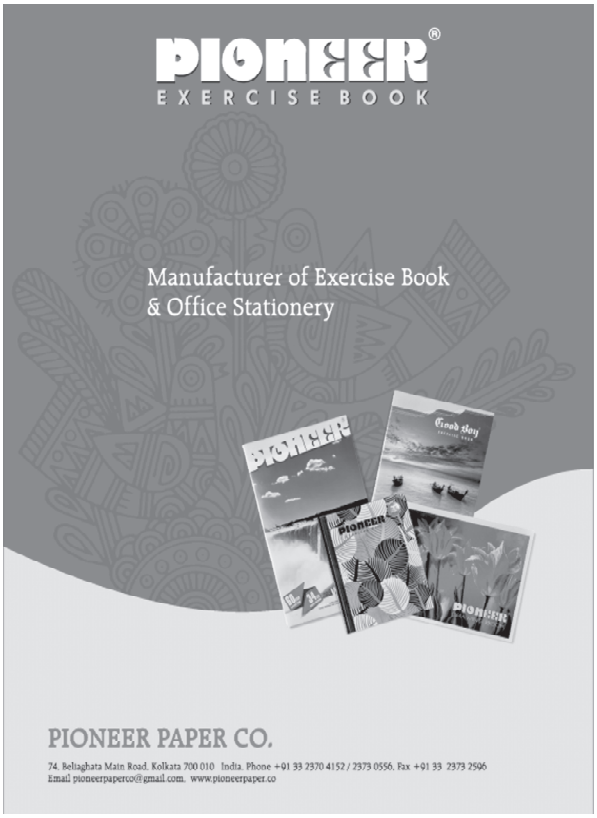

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

স্বনির্ভর ভারত গড়তে মোদী সরকারের উন্নয়নমুখী গতিশীল আর্থিক বাজেট

আনন্দ মোহন দাস

চমক দেওয়ার সস্তার রাজনীতি ছেড়ে দেশের বুনিয়াদি আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সংসদে আর্থিক বছর ২০২২-২৩-এর বাজেট প্রস্তাব যথেষ্ট প্রশংসনীয়। বলাবাহুল্য, এবারের বাজেট কোনও নির্বাচনমুখী বাজেট নয়, আর্থিক বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের বাজেট। এবারের বাজেট পরিকাঠামো উন্নয়নের বাজেট, এবারের বাজেট দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক উন্নয়নের দূরদর্শী বাজেট। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের আত্মনির্ভর ভারত গঠনের বাজেট। এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ২০২১-২২ আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের বলিষ্ঠ আর্থিক পদক্ষেপে বিগত দুই বছরের বৈশ্বিক করোনা মহামারীর বিপদকে প্রতিহত করে ভারতবর্ষ এখন বিশ্বের সবচেয়ে গতিশীল অর্থনীতির দেশ। কোভিডের প্রকোপে স্বাস্থ্য খাতে বিশাল ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থনীতির উপর আকস্মিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এখন পর্যন্ত ১৭০ কোটি বিনামূল্যে টিকা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নির্মাণে বিপুল ব্যয় সত্ত্বেও বর্তমান আর্থিক বছরে আনুমানিক আর্থিক ঘাটতি গড় জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ৬.৯% -এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে এবং গড় জাতীয় আয়ের ৯.২% -এর মধ্যে থাকবে যা বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বে সর্বোচ্চ থাকারই সম্ভাবনা।

বাজেট মূল্যায়নের প্রথমেই বলা যায় দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে এবং আর্থিক পরিকাঠামো সুদৃঢ় করতে মূলধনী খাতে ৭৫০ হাজার কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব একটি যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

> এবারের বাজেট গতানুগতিক বাজেট নয়। এবারের বাজেট ভারসাম্যযুক্ত দীর্ঘ মেয়াদি আর্থিক উন্নয়ন ও স্থায়ী বৃদ্ধির গতিশীল বাজেট।

বর্তমান আর্থিক বছরে এই খাতে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে আগামী অর্থিক বছরে এই খাতে শতকরা ৩৫.৪ ভাগ টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পরিকাঠামোগত মূলধনী খাতে (Capital Expenditure) বিপুল পরিমাণ এই খরচের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হবে এবং ভারী ও লঘু উদ্যোগের পণ্যগুলির বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ফলে এই সমস্ত উদ্যোগের বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির (MSME) উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। পরিকাঠামো শিল্পে ব্যবহৃত সিমেন্ট, স্টিল-সহ নির্মাণশিল্পে উৎপন্ন পণ্যগুলির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। তার ফলে আনুষঙ্গিক শিল্পও লাভবান হবে। এইভাবে সরকারি বিনিয়োগের ফলে বেসরকারি বিনিয়োগও স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থিক গতি ত্বরান্বিত হবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে পরিকাঠামো খাতে আনুমানিক এক লক্ষ কোটি মূলধনী বিনিয়োগ করলে আর্থিক উৎপাদন ২,৪৫,০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ৭ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা সরকারি বিনিয়োগের ফলে বিপুলভাবে আর্থিক উৎপাদন সৃষ্টি হবে এবং দেশীয় অর্থনীতিতে গতি আসবে। স্থায়ী উন্নয়নের দিগন্ত খুলে যাবে।

এবারের বাজেটে ২৫ হাজার কিমি জাতীয় সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বাবদ ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। স্বাভাবিকভাবে সড়ক নির্মাণের ফলে মুক্ত শিল্পগুলির উৎপাদিত পণ্য সিমেন্ট, স্টিল, সড়ক নির্মাণে ব্যবহৃত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতির

ফঃ ৬

উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে এবং এই শিল্পের উন্নতি ঘটবে। সড়ক নির্মাণে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও যন্ত্র তৈরির কারখানাগুলিরও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

জাতীয় সড়ক নির্মাণ হলে মূলত পরিবহণ শিল্প ও মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। তাছাড়া কম খরচে পণ্য পরিবহণ গতিসম্পন্ন হবে। কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত পণ্য কম খরচে শীঘ্র উপযুক্তস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ জাতীয় সড়কের মাধ্যমে কৃষকরাও লাভবান হবে। এছাড়াও এবার বাজেটে 'প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি মিশন' প্রকল্প নামে এক যুগান্তকারী ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে রেল, বন্দর, বিমান বন্দর, রাস্তা, গণ পরিবহণ, জল পরিবহণ ও লজিস্টিক পরিকাঠামো-সহ সাতটি ক্ষেত্রে একই ছাদের নীচে বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণে উন্নয়নমুখী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সঠিক উদ্যোগ। এর ফলে গতিশক্তি প্রকল্পগুলি সময়ে সম্পন্ন হবে এবং নির্ধারিত ব্যয়ের খরচ সীমাবদ্ধ থাকবে। সর্বমোট একলক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পে বর্তমান বাজেটে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রয়েছে।

জাতীয় সড়ক নির্মাণ ছাড়াও বাজেটে উন্নত আধুনিক রেল পরিষেবার জন্য ৪০০টি বন্দে ভারত ট্রেনের প্রস্তাব রয়েছে। ১০০টি কার্গো টার্মিনালের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল পরিবহণে বা নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত পণ্য পরিবহণে প্রভূত উন্নতি হবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে কোনও দেশের লজিস্টিক পরিকাঠামো উন্নত থাকলে আর্থিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত হয় এবং পরিবহণ খরচ কম হয়। সুতরাং গতিশক্তি প্রকল্পে লজিস্টিক পরিকাঠামো উন্নয়ন একটি সঠিক পদক্ষেপ বলেই মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। বিশ্বব্যাপী এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতের গড় লজিস্টিক খরচ গড় জাতীয় আয়ের (GDP) প্রায় ৮% থেকে ৯% মাত্র। সেজন্য বিদেশে বিনিয়োগের জন্য এই ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন স্বাভাবিকভাবেই খুবই জরুরি। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি, সময়ে কাজ সম্পন্ন ও অতিরিক্ত খরচের সম্ভাবনা কমে যাবে।

উদাহরণস্বরূপ গতিশক্তি প্রকল্পে বন্দর, বিমানবন্দর নির্মাণ হলে এই শিল্পে ব্যবহৃত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হবে, কর্মসংস্থান হবে এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ এক আর্থিক উন্নয়নের চক্র তৈরি হবে।

বাজেটে আর্থিক বছর ২০২২-২৩-এর জন্য রেলের বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ১৪০৩৬৭ কোটি টাকা যা আগের অর্থ বছরের তুলনায় ২৭.৫% বেশি।

আগামী অর্থবছরে বাজেটে সৌরশক্তি ও সবুজ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন ভিত্তিক উৎসাহভাতা (ইনসেনটিভ) প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং এর ফলে দেশে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

আগামী অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যার মাধ্যমে স্বল্প মূল্যের ৮০ লক্ষ গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা যাবে। এই প্রকল্পে গরিব ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন। স্বাভাবিকভাবে গৃহনির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত দ্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে কর্মসংস্থান ও রোজগার বৃদ্ধি হবে তথা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

বাজেট প্রস্তাবে প্রত্যেক বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে আগামী অর্থবর্ষে 'হর ঘর নল প্রকল্পে' ৬০ হাজারকোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে মোদী সরকারের জনকল্যাণকর পরিষেবা দেওয়ার সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকল্পে আগামী বছর তিন কোটি আট লক্ষ পরিবার শুদ্ধ পানীয় জল পাবেন। এই পরিকাঠামো নির্মাণে স্বাভাবিকভাবে এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পাইপ শিল্পের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে।

কৃষি

কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা বাজেট প্রস্তাবে রয়েছে। যেমন—

(ক) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসাবে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি মোট ২ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি টাকা প্রদান। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের (চাল, গম, ডাল ইত্যাদি) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাবদ অর্থ প্রদান করার জন্য কৃষকদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে। স্বাভাবিকভাবে চাষি উৎপাদনে উৎসাহী হবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমস্ত কিছুর চাহিদা বৃদ্ধি পাবে কারণ গ্রামের ৭০ ভাগ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল।

(খ) সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারির মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। উন্নত চাষ, নজরদারি ইত্যাদির জন্য শিল্পে ড্রোন প্রযুক্তির প্রয়োগ।

(গ) গঙ্গাতীরবর্তী পাঁচ কিলোমিটার চওড়া করিডোরের মাধ্যমে জৈব চাষের প্রস্তাব।

(ঘ) গ্রামীণ কৃষি, শিল্প ও স্টার্ট আপের জন্য নাবার্ডের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণের প্রস্তাব।

প্রতিরক্ষা

আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিরক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের শতকরা ৬৮ ভাগ অর্থ দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উৎপাদিত দেশীয় পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দেশীয় শিল্প উৎসাহিত হবে এবং আনুষঙ্গিক শিল্পের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে। মোটের উপর দীর্ঘমেয়াদি স্বনির্ভর আর্থিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে। বলাবাহুল্য, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদক সংস্থাগুলির অস্ত্রশস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি হবে এবং রপ্তানিও বৃদ্ধি পাবে। রপ্তানি থেকে দেশীয় সংস্থাগুলি লাভবান হবে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশ স্বনির্ভর হলে ভারত সরকারের অস্ত্রশস্ত্র

আমদানির খরচ কম হবে এবং রপ্তানি করতে সক্ষম হবে। এটি মূলত আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট যোজনা। বলাবাহুল্য, নরেন্দ্র মোদীর আগে দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রীই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহস দেখাননি। বর্তমান আর্থিক বছরে (২০২১-২২) প্রতিরক্ষা খাতে ৩৪% অর্থ দেশীয় সংস্থাগুলির প্রতিরক্ষা খাতে ক্রয় করার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে এই তথ্য সামনে এসেছে। মূলত এই ক্ষেত্রে দেশীয় কোম্পানিগুলি আর্থিকভাবে মজবুত হবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। দেশ অস্ত্রশস্ত্র আমদানির পরিবর্তে বিশ্বের অন্য দেশে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি করতে সক্ষম হবে। সীমান্তবর্তী সমস্যা ও বিদেশি শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করতে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশকে মজবুত করতে বাজেট বরাদ্দ ১২.৮% বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী অর্থবর্ষে বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে সর্বমোট ৫ লক্ষ২৫ হাজার১৬৬ কোটি ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তারমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রযুক্তি ক্রয় করার জন্য ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৬৮% খরচ দেশীয় কোম্পানিগুলির জন্য বরাদ্দ ছাড়াও, বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য পৃথকভাবে ২৫% অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সীমা সুরক্ষার জন্য সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে পরিকাঠামো নির্মাণে ২১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব রয়েছে।

শিক্ষা

বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী আগামী বাজেটে ডিজিটাল শিক্ষার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ডিজিটাল মাধ্যমে তথা ২০০টির বেশি নতুন টিভি চ্যানেলে শিক্ষা প্রদান করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

করোনাকালে গ্রামীণ এলাকায় গরিব মানুষের অনলাইন শিক্ষার অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে।

আগামী আর্থিক বাজেটে (২০২২-২৩) শিক্ষাক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৪ হাজার ২৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা আগের বছর অপেক্ষা ১২% বেশি। নতুন শিক্ষানীতি চালু-সহ ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত গ্রামে ডিজিটাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য অপটিক্যাল ফাইবারের সাহায্যে ভারত নেটের মাধ্যমে সমস্ত গ্রাম ও গ্রামবাসীদের যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষা সংস্কার এবং ডিজিটাল শিক্ষাক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তা না হলে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির চেয়ে আমরা পিছিয়ে পড়বো বলেই অনুমান। কেন্দ্রীয় সরকারের ই-বিদ্যা প্রকল্পের অন্তর্গত কর্মসূচি অনুযায়ী বিশ্বমানের ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে বেশি সংখ্যক পড়ুয়াকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার বাজেট প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ বিধিনিষেধ ব্যতিরেকে উচ্চমানের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমতি দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। প্রাথমিকভাবে গুজরাটের গিফট সিটিতে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার প্রস্তাব রয়েছে। মূলত এর মাধ্যমে বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি এবং আর্থিক প্রযুক্তি বিদ্যার (ফিনানসিয়াল টেকনোলজি) পাঠক্রম চালু করার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দুই লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি বিদ্যালয়কে উন্নত করার লক্ষ্যে বাজেট প্রস্তাব রয়েছে যার ফলে শিশু ও মহিলারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলেই অর্থনীতিবিদ্‌দের বিশ্বাস।

শিল্প

শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) বা লঘু উদ্যোগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের গত জাতীয় আয়ের (জিডিপি) শতকরা ৩০ ভাগ আসে এই ক্ষেত্র থেকে এবং এই উদ্যোগের রপ্তানি থেকে আসে শতকরা ৪০ ভাগ। দেখা গেছে ভারতীয় অর্থনীতিতে এই সমস্ত সংস্থা থেকে কমপক্ষে ১০০ মিলিয়নের উপর লোকের কর্মসংস্থান হয়। সেজন্য বাজেটে এই ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে জরুরি ভিত্তিতে ঋণ দেওয়ার গ্যারান্টি প্রকল্পের মেয়াদ (ECLGS) আরও একবছর বৃদ্ধি ক'রে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যার ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি লাভবান হবে এবং আর্থিক সমৃদ্ধি আসবে। সরকারি গ্যারান্টির মাধ্যমে এই সংস্থাগুলি জরুরি ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিতে পারবে। বাজেটে সরকারি গ্যারান্টির পরিমাণ অতিরিক্ত ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। মূলত করোনা মহামারীর প্রকোপে বিপর্যস্ত পর্যটন, হোটেল, রেস্তোরাঁ শিল্প তথা আতিথেয়তা শিল্পের উন্নতির জন্য এই গ্যারান্টি প্রকল্পের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। বাজেটে এমার্জেন্সি ক্রেডিট লাইন গ্যারান্টি স্কিমে (ECLGS) সর্বমোট ৫ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে।

ডাকঘর আধুনিকীকরণ

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্নপূরণে এবার বাজেটে ১৫৫ হাজার পোস্ট অফিসকে কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন (CBS)-এর মাধ্যমে অনলাইন লেনদেন করার জন্য সক্ষম করে তোলা হবে। তথ্যসূত্রে জানা যায় ২৫ হাজার ডাকঘর শহর এলাকায় অবস্থিত। বাকি ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডাকঘর গ্রামীণ এলাকায়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ব্যাঙ্কের শাখা নেই কিন্তু ডাকঘর আছে। সুতরাং ডাকঘরগুলিকে কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশনের মাধ্যমে যুক্ত করলে গ্রামীণ এলাকার মানুষেরা ব্যাঙ্কের লেন-দেনও ডাকঘরের মাধ্যমে করতে পারবেন। ডাকঘরগুলিতে এটিএম (ATM) পরিষেবাও থাকবে। এর ফলে গ্রামীণ এলাকায় ডাকঘরগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে ভারতীয় অর্থনীতিতে। বর্তমানের চাহিদা অনুযায়ী এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ বলেই অনেকে মনে করছেন।

বিশেষ আর্থিক অঞ্চল

মূলত এসইজেড আইনটি ২০০৫ সালে তৈরি হয় রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। সেইজন্য বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বাজেটে এই আইনটির সংশোধনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বর্তমানের প্রস্তাবিত আইনের সাহায্যে

রাজ্যসরকার অংশগ্রহণ করে সার্বিক উন্নয়ন প্রণালীর ভাগীদার হতে পারবে। এই পরিবর্তন আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চালু হবে। তথ্যসূত্রে জানা যায় বর্তমান আর্থিক বছরে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এসইজেডের মাধ্যমে ৬ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ এসেছে এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি টাকা রপ্তানি হয়েছে। যা আগের বছরের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি বলে জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য

এবারের স্বাস্থ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী ৮৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ গবেষণা কেন্দ্রের জন্য অতিরিক্ত ৩২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন। সর্বোপরি বাজেটে এবার স্বাস্থ্যখাতে ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছে। বলা বাহুল্য বর্তমান আর্থিক বছরে (২০২১-২২) করোনা মহামারীর ভয়াবহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, বিনামূল্যে টিকা প্রদান ও হাসপাতালগুলির জন্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে। তার ফলে কেন্দ্রকে স্বাস্থ্যখাতে অপরিকল্পনীয় ব্যয় করতে হয়েছে। সেইজন্য আগামী বছর স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় খরচ কম থাকার সম্ভাবনায় ২০০ কোটি টাকা বাজেট বৃদ্ধি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এবারের বাজেট প্রস্তাবে 'আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল হেলথ্ মিশনের' অর্ন্তগত সারাদেশে ২৩টি টেলি কাউন্সেলিং চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করার প্রস্তাব রয়েছে। যার মূল কেন্দ্র হবে ব্যাঙ্গালোরের ন্যাশান্যাল ইন্সস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্স (NIMHANS)। এই টেলি কাউন্সেলিঙের মাধ্যমে করোনা সংক্রমণকালে কোভিডের প্রকোপে মানসিক অবসাদগ্রস্ত মানুষদের টেলিফোনে কাউন্সিলিঙের ব্যবস্থা থাকবে।

তাছাড়াও আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্য কার্ড যা কিনা আধার ও মোবাইল লিঙ্কড থাকবে, যার ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এই স্বাস্থ্যকার্ডে উল্লেখ থাকবে এবং নাগরিকদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার পথ সুগম হবে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় প্রত্যেক বাজেটের সময় কোনো জিনিসে কর বাড়লো বা কমলো তা নিয়ে সকলেরই একটা উদ্বেগ বা আগ্রহ থাকে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী গতানুগতিক বাজেটের ধারাটি বদল করেছেন এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক বৃদ্ধির বাজেট তৈরি করেছেন। উল্লেখ করা যায় কোভিড মহামারীর কারণে কেন্দ্রীয় সরকার বিপুল খরচ বহন করা সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী গরিব বা মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য কোনোরকম কর বৃদ্ধি করেননি। আমরা জানি এখন পর্যন্ত ১৭০ কোটি বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদান ও ওষুধপত্র ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নির্মাণে বিপুল খরচ, জনগণের মনে কর বৃদ্ধির আশঙ্কা ছিল কিন্তু সব কিছু নস্যাৎ করে কর বৃদ্ধি করেননি। অথচ সব অর্থমন্ত্রীই আয় বৃদ্ধি করার জন্য ট্যাক্স বৃদ্ধির রাস্তাকেই হাতিয়ার করেন। এমনকী গত দুই বছর অর্থমন্ত্রী আয়করের হারের কোনো পরিবর্তন না করে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

যে সমস্ত বিনিয়োগকারী মূলধনী সম্পদ বা অনথিভুক্ত শেয়ারে বিনিয়োগ করেন, তাদের অতিরিক্ত সারচার্জ তুলে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভে (LTCG) সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ কর দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। এটি কর সরলীকরণের একটি পদক্ষেপ।

বাজেটে ক্রিপটোকারেন্সির লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী ৩০ শতাংশ কর বসানোর প্রস্তাব রেখেছেন। ক্রিপটোকারেন্সি হলো একটি অনলাইন মুদ্রা। নেট ছাড়া তার কোনো অস্তিত্ব নেই। ভারতে এটির এখনও আইনি স্বীকৃতি নেই তবে একটি কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখছেন। এই ধরনের অন্ধকার জগতের ডিজিটাল লেনদেনকে নিরুৎসাহিত করতে অর্থমন্ত্রী এই ট্যাক্স বসিয়েছেন বলেই সকলে মনে করছেন।

এবারের বাজেটে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ডিজিটাল মুদ্রা চালু করার প্রস্তাব। যা সাধারণ মুদ্রার পরিবর্ত বা বিকল্প হিসাবে ডিজিটাল মুদ্রার লেনদেনের প্রচলনের পরিকল্পনা। ডিজিটাল মুদ্রা কেবলমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কই নিয়ন্ত্রণ করবে এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

কোনো আর্থিক বছরে আয়করদাতা ভুল আয়কর রিটার্ন জমা করে থাকলে, দুই বছরের মধ্যে তা সংশোধনের সুযোগ বাজেট প্রস্তাবে রাখা হয়েছে। নতুন স্টার্ট আপদের ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়ের সুবিধা আগামী মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদি বৃদ্ধির বাজেট প্রস্তাবে রয়েছে।

আয়কর আইনের ২৮(৪) নং ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে পার্কস বাবদ ২০ হাজার টাকার বেশি প্রদান করা হলে উৎসমূলে ১০ শতাংশ কর কাটার প্রস্তাব রয়েছে।

আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে চিপ ভিত্তিক ই-পাশপোর্ট চালু করার কথা বাজেটে উল্লেখ করেছেন অর্থমন্ত্রী। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকরা উপকৃত হবেন।

এবারের বাজেটে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো নদী সংযুক্তীকরণ প্রকল্প। আনুমানিক ৪৪৬০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কেন-বাতওয়া নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের রূপায়ণের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড এলাকা খরামুক্ত হবে এবং এখানকার কৃষকরা কৃষিকাজে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। আগামী ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে প্রকল্প রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকার ১৪০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে। এছাড়া আরও পাঁচটি নদী সংযুক্তীকরণ প্রকল্প চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন। উপকৃত রাজ্যগুলি একমত হলেই কেন্দ্র প্রকল্প রূপায়নে অর্থ বরাদ্দ করবে বলেই অর্থমন্ত্রী বাজেটে উল্লেখ করেছেন। এই প্রকল্পে মূলত দক্ষিণভারত, মধ্যভারত ও পশ্চিমভারত উপকৃত হবে বলেই অনুমান।

পরিশেষে সংক্ষেপে বলা যায় এবারের বাজেট গতানুগতিক বাজেট নয়। এবারের বাজেট ভারসাম্যযুক্ত দীর্ঘ মেয়াদি আর্থিক উন্নয়ন ও স্থায়ী বৃদ্ধির গতিশীল বাজেট। বলা বাহুল্য এবারের বাজেট প্রস্তাব দিশাহীন বিরোধীপক্ষ ও মোদী বিরোধী দিগ্‌গজ অর্থনীতিবিদ্‌দের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে বলেই অনেকে মনে করছেন। □

জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী অমর জ্যোতিতে বিলীন

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১০টায় কলকাতার উল্টোডাঙ্গায় নিজ বাসভবনে দেহ রাখলেন প্রবীণ স্বয়ংসেবক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী (খোকাদা)। বাল্যকালে গিরিশপার্ক অঞ্চলে থাকতেন। বাবা যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে তৎকালীন প্রচারক অনন্তলাল সোনীর পরিচয় হয়েছিল। সেই সূত্রে ও খেলার আকর্ষণে খোকাদার শাখায় আসা শুরু। তিনি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বি.এসসি পাশ করে সফলতার সঙ্গে চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে উল্টোডাঙ্গাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে শাখার কার্যবাহ হয়ে কার্যকর্তা হওয়া শুরু। পরে ধীরে ধীরে প্রান্তের বৌদ্ধিক প্রমুখ, কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক, প্রান্ত তথা পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন। ব্যক্তিগত পড়াশোনার পরিধি ছিল বিশাল। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য, কবিতা— যে কোনো প্রসঙ্গে পুরানো ঘটনার উদাহরণ রাখতেন। কাজের ফাঁকে নিজের অফিসে বসেই বিভিন্ন জেলার কার্যকর্তাদের ফোন করে খবর নিতেন। কার্যকর্তা হিসেবে সঙ্ঘের দায়িত্ব ছাড়াও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রথম সভাপতি, তাছাড়া ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি, ভারতীয় সংস্কৃতি ট্রাস্ট, স্বস্তিকা প্রকাশন ট্রাস্টের দীর্ঘদিন সদস্য থেকে কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি রেখে গেছেন ২ পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক।

।। সংযোজন ।। এক ছুটির দিন বিকালে যতীনবাবু গিরিশ পার্কে পায়চারি করছিলেন। চোখে পড়লো কিছু তরুণ যুবক ড্রিল করছে। তিনি কিছুক্ষণ ধরে ওদের দেখেছিলেন। খুবই আগ্রহের সঙ্গে সমস্ত কার্যক্রম লক্ষ্য করলেন তিনি। শেষে যিনি পরিচালনা করছিলেন, তাঁকে নাম জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'আমার নাম অনন্ত', একদম পরিষ্কার বাংলায় তাঁকে উত্তর দিলেন।

কিছুদিন ধরেই যতীনবাবু লক্ষ্য করছিলেন যে তাঁর একমাত্র পুত্র খেলার থেকে খেলা দেখায় বেশি উৎসাহী। কোনোক্রমে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বইয়ের ব্যাগটি টেবিলে রেখে কখনো ইস্টবেঙ্গলের মাঠে তো কখনো মোহনবাগান বা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে খেলা দেখতে ছুটে যাচ্ছে। ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে পড়তে বসে ঘুমিয়ে পড়ছে। যতীনবাবু ছেলেকে নিয়ে একটু চিন্তিত ছিলেন। মনে মনে ভাবলেন ছেলেটা যদি বাড়ির পাশে এখানে এদের সঙ্গে শরীরচর্চা, খেলাধুলা করে তাহলে তিনি খুব নিশ্চিন্ত হন। এই সব ভেবে প্রচারক অনন্তলাল সোনীকে অনুরোধ করলেন, 'আমার ইচ্ছা আমার ছেলেটাও আপনাদের সঙ্গে এসে খেলাধুলা করুক'। অনন্তদা তো এই কাজেই নিবেদিতপ্রাণ। কালবিলম্ব না করে সেইদিনই তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর পুত্রের সঙ্গে আলাপ করলেন এবং পরের দিনই সঙ্গে করে শাখার মাঠে নিয়ে এলেন। যতীনবাবুর পুত্রটি আর কেউ নন, আমাদের বিশেষ করে আমার সঙ্ঘজীবনের অভিভাবক স্বরূপ জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, আমাদের সকলের প্রিয় খোকাদা। বাল্যাবস্থা থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই উল্টোডাঙ্গা শাখার মুখ্য শিক্ষক এবং শাখার কার্যবাহ হন। দীর্ঘদিন আমার সঙ্গে সম্পর্ক, আমিও তাঁর অনুগামী, তিনি আমার অভিভাবক। নিজের প্রফেশনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘ কাজের দায়িত্ব বেড়েছে ধীরে ধীরে। পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। তারপর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন হয়নি। খোকাদার হবি ছিল বই পড়া। নিয়মিত বই পড়তেন। সঙ্ঘের কথা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করতেন। তাঁর বক্তব্য যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক হতো, তেমনি আধুনিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা গ্রহণযোগ্য হতো। আমার ব্যক্তিগত বৌদ্ধিক জ্ঞান খোকাদার থেকেই আহরিত। আমার বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি এত পড়াশোনা কখন করো?' তখন মনে মনে বলি, 'সবই খোকাদার আশীর্বাদে।' খোকাদা যেমন রসিকপ্রবর ছিলেন ঠিক তেমনি অভিভাবক সুলভ শাসন করতেন। কলেজে ভর্তি হয়েছি, জিন্সের প্যান্ট পরে কলেজ যাচ্ছি, দেখা হতে কিছু বললেন না। রাত্রিবেলায় বাড়িতে এসে বললেন, 'এই ধরনের প্যান্ট বিদেশে মাইনিঙের লেবাররা পরে।' ব্যাস, আমার জিন্স পরা বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর মাঝখানে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। হঠাৎ ২৬ তারিখ রাত্রিতে জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর কনিষ্ঠপুত্র সুজনের ফোন পেয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল। সবই শুনলাম, মনে হলো আমার কোনো একটা দিক ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এলাম, আপাতদৃষ্টিতে সবই ঠিক আছে, কিন্তু না, মনটা কোথাও যেন শূন্য হয়ে গেছে। ওই শূন্যস্থানটা আর কেউ ভরাতে পারবে না। সঙ্ঘ জীবনের বাঁধনগুলো একটা একটা করে খসে পড়ছে। ফুল নয়, মালা নয়, শুধু একটি প্রণাম নিবেদন করেই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম।

(স্মৃতিচারণ : সুশান্ত রঞ্জন পাল)

সারা দেশের কৃতী শিশুরা পুরস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আজকের নতুন ভারতে ছোটো থেকে বড়ো সকলেই কৃতিত্ব ও যোগ্যতার জন্য প্রাপ্য স্বীকৃতি এবং সম্মান পান। উল্লেখযোগ্য অবদান এবং অসামান্য কৃতিত্বের

জন্য দেশের শিশুরা যখন সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয় তখন তারা সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত হয়, অনুপ্রাণিত হয়। 'জাতীয় শিশু কন্যা দিবস' এবং 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব'-এর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৪ জানুয়ারি দেশের শিশুদের প্রতিভা এবং অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বালক পুরস্কার ২০২২ প্রদান করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বালক পুরস্কার' বিজয়ীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'তোমরা শিল্পসংস্কৃতি থেকে শুরু করে সাহসিকতা, শিক্ষা থেকে উদ্ভাবন, সমাজসেবা ও খেলাধুলা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তোমাদের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার পেয়েছো এবং কঠিন প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছো। দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে শিশুরা অংশগ্রহণ করেছে এবং তাঁদের মধ্যে থেকে তোমাদের নির্বাচিত করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপকের সংখ্যা হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু আমাদের দেশে অসংখ্য প্রতিভাবান শিশুও রয়েছে।' শিশুদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতার সময় তাদের অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট জেলার ডিএমও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর নয়াদিল্লিতে পুরস্কার প্রাপক শিশুদের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু এবার কোভিড মহামারির কারণে তা সম্ভব হয়নি, ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

শিশুদের পুরস্কৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমরা গর্ববোধ করি, যখন দেখি ভারতের তরুণ-তরুণীরা স্টার্টআপের জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা গর্ববোধ করি যখন দেখি যে ভারতের তরুণরা নতুন উদ্ভাবন করছে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাদিবসে তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে পালিত হলো, জঙ্গি সংগঠন সিমির নবরূপ পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাদিবস। ১৭ ফেব্রুয়ারি পিএফআই-এর ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। গোয়েন্দা সংস্থা এবং এনআইয়ের তদন্তে পিএফআই দেশের নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির স্লিপার সেল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ সেই নিষিদ্ধ সংগঠনের অনুষ্ঠানে শাসক দলের বিধায়কের উপস্থিতি নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে।

ইতিমধ্যে জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে জেএমবি এবং সিমি-সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছে অন্যান্য রাজ্যগুলো। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বারবার পিএফআই, জেএমবি ও সিমির মতো সংগঠন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনকে সতর্ক করেছে। তা সত্ত্বেও ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করতে জঙ্গি কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দিচ্ছে শাসক দল, এমনটাই অভিযোগ রাজ্যের বিরোধী দলগুলোর।

২০১২ সালে কেরল সরকার হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে জানায় যে পিএফআই-এর কার্যকলাপ দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ২০২০-তে ব্যাঙ্গালুরু দাঙ্গায় মদত দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পিএফআই-এর বিরুদ্ধে। একসময় তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খানের নাম জড়ায় এই সংগঠনের সঙ্গে। কেরলের কন্নুরে এবিভিপি কর্মী শ্যামপ্রসাদ খুনের নেপথ্যে পিএফআই দোষী সাব্যস্ত হয়। সিএএ ও এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল পিএফআই-এর। কিছুদিন আগেই জঙ্গি কার্যকলাপ যোগ নিয়ে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার নাম। জঙ্গি কার্যকলাপ ঘটানোর পরিকল্পনা নিয়ে ১১ জন পিএফআই সদস্য এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এই মর্মে সতর্কতা জারি করেছিল এনআইএ। তারপরেও নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে শাসকদলের যোগ এ রাজ্যের নিরাপত্তাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফেরাতে ‘অপারেশন গঙ্গা’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনে আটকে পড়ুয়াদের দেশে ফেরাতে একটি অপারেশন চালু করেছে ভারত সরকার, নাম— অপারেশন গঙ্গা। বিদেশ রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান ভারতীয়দের নিয়ে দেশে ফিরছে ‘অপারেশন গঙ্গার এটি দ্বিতীয় বিমান, ইতিমধ্যেই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছে। বিদেশ সচিব হর্ষ ভি শ্রিংলা বলেন, ‘এই প্রক্রিয়া সরকারি খরচে হবে। নির্দিষ্ট সীমান্ত ক্রসিং পয়েন্টগুলি ডিমার্কেশন করা হয়েছে। মিনিস্ট্রি অব এক্সটারনাল এফেয়ার্স (এমইএ)-র তরফ থেকে এই প্রক্রিয়াতে সহায়তা করার জন্য একটি দল গঠন করা হয়েছে।’ যেহেতু ইউক্রেনের আকাশপথ বন্ধ ভারত তাই হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া ও রোমানিয়া থেকেই ভারতীয়দের দেশে ফেরানো কাজ

করছে। কিন্তু আটকে পড়া ছাত্রদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করছে, মিডিয়াকে তারা জানিয়েছে যে ছাত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে একটি বৈষম্য দেখা দিয়েছে, যে ছাত্ররা এমপি, এমএলের সঙ্গে যুক্ত তাদের সরিয়ে আনা হচ্ছে আগে। সাধারণ পরিবারের ভারতীয় ছাত্রদের ইউক্রেনে স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্ররা মিডিয়ার মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে ব্যাপারটা তদারকি করার জন্যে আর্জি জানিয়েছে।

যুদ্ধের জেরে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের জেরে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক মূল্যমান নির্ধারক সংস্থা ব্রেন্ট ক্রুডের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের প্রতি

ব্যারেলের দাম ৪.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০২.০৮ ইউএস ডলার হয়েছে। এর ফলে পেট্রোল- ডিজেলের দাম আবার বাড়বে বলে জানিয়েছে। যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে ভারতের শেয়ার বাজারেও। সম্প্রতি টাকার দাম আমেরিকান ডলারের তুলনায় ৪০ পয়সা পড়েছে বলে জানা গেছে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্সের পতন হয়েছে ১.২৭ শতাংশ (৭০৯.১৫ পয়েন্ট)। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ১৯৮.১৫ পয়েন্ট নীচে নেমে ৫৫,১৪৯.৩৭ পয়েন্টে এখন ট্রেড করছে। এদিকে সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পুতিন রাশিয়ার সামরিক বাহিনীকে প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ন্যাটোর সদস্য কয়েকটি দেশের ইউক্রেন নিয়ে উত্তেজক বিবৃতির কারণেই এই নির্দেশ বলে জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট।

মা সি ক রা শি ফ ল

ফেব্রুয়ারি (২০২২)

অধ্যাপক অমিত শাস্ত্রী

মেষ : কোনো পাবলিক সেক্টর থেকে লাভ বা আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে। পিতার সঙ্গে মতানৈক্য। সাহসিকতা ও বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা। নিকট বন্ধুর সাহায্যে উন্নতি। তবে উন্নতিতে বাধা আসতে পারে। গোপন কোনো সূত্রে অর্থ আসতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সমস্যা হতে পারে।

বৃষ : সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ। আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে পূরণ হতে পারে। মামলাতে নিষ্পত্তি। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে লাভ। কোনো মহিলার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। অত্যধিক আমোদ প্রমোদের জন্য উন্নতিতে সমস্যা হতে পারে। শত্রু দ্বারা সমস্যা হতে পারে। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি হতে পারে।

মিথুন : উচ্চশিক্ষায় লাভ। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির থেকে লাভ। কোনো দুর্ঘটনা থেকে সাবধানে থাকতে হবে। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা। হঠাৎ প্রাপ্তি হতে পারে। ভ্রমণে আনন্দ লাভ। উন্নতির কোনো দরজা খুলতে পারে। শারীরিক অসুস্থতা। বন্ধুর কাছ থেকে বিপদ আসতে পারে।

কর্কট : পারিবারিক কারণে মানসিক উদ্বেগ। মাসের প্রথমার্ধে পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য। বিবাদে জয়লাভ। উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য। অত্যধিক ব্যয়বৃদ্ধি। দাম্পত্য কলহ। কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে বিলম্ব। কর্মে পরিবর্তন হতে পারে। সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।

সিংহ : ব্যবসায়ীদের জন্য এই মাস ভালো যাবে না, বিশেষ করে অংশীদারি ব্যবসায়ে ক্ষতি। কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য কর্মের দিকে প্রবণতা। সহজে ঋণ পেতে পারেন। হজমের সমস্যা। মানসিক কারণে স্বাস্থ্যহানি। কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বিরোধ হতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ। পত্নীর স্বাস্থ্য হানি। ভ্রমণে বিপত্তি। পিতা বা মাতার স্বাস্থ্য হানি।

কন্যা : কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ে লাভ হবে। কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ। বংশগত কোনো রোগে ভোগান্তি। ফাটকায় লাভ। ছাত্রদের মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। আত্মীয় বা প্রতিবেশীর সঙ্গে অশান্তি। ভ্রমণে বাধা। নিজ বুদ্ধির জন্য উন্নতি।

তুলা : সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা, সরকারি দপ্তর থেকে কোনো সুবিধা পেতে পারেন। ছোটোখাটো অশান্তির মধ্য দিয়ে জমি বা গাড়ি প্রাপ্তি, তবে নিজ বুদ্ধির দোষে অর্থ নষ্ট হতে পারে। গৃহ নিয়ে দুশ্চিন্তা। শিল্পকলায় উন্নতি, লিভার ঘটিত কোনো রোগে ভুগতে পারেন। পরিবারের জন্য মনোকষ্ট। কোনো মহিলার দ্বারা শত্রুতা। নিজ চেষ্টায় অর্থ আসবে। দাম্পত্য জীবনে কলহ ও বিশৃঙ্খলা।

বৃশ্চিক : মায়ের জন্য উন্নতিতে বাধা, পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি হতে পারে, সন্তানের কারণে মানসিক সুখ প্রাপ্তি, আত্মীয় বা প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক, জাতকের ইচ্ছাশক্তি ও সাহসের মাধ্যমে উন্নতি হবে। ছোটোখাটো ভ্রমণ হতে পারে। ব্যবসার কারণে দুশ্চিন্তা, সঞ্চয়ের প্রবণতা, শিক্ষার জন্য খুব ভালো সময়, ভ্রমণে আনন্দ ও অর্থ দুই আসতে পারে। নিজের বুদ্ধির কারণে অনেক কাজ হাসিল হতে পারে। নিম্নস্থ কর্মচারীর দ্বারা লোকসান। ছোটোখাটো অশান্তি হতে পারে।

ধনু : জাতক কোনো সরকারি সহায়তা পেতে পারে। মায়ের কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তি, ছাত্রদের জন্য মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ভালো সময় যাবে। কোনো সাহসিকতামূলক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে নিজের অর্থ আসবে। অর্থ আসলেও, তবে অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা থাকবে। ভ্রমণের যোগাযোগ হবে। আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে লাভ পেতে পারেন। বন্ধুর বা সন্তানের কারণে জীবনে দুঃখ পাবেন।

মকর : কোনো সরকারি কাজকর্ম থেকে অর্থ আসবে, নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি গড়ে উঠবে এবং যে কোনো ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ফলে কোনো প্রতারকের জন্য অর্থ নাশ হতে পারে। মায়ের শরীর অসুস্থ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হতে পারে।

কুম্ভ : জাতকের রোগমুক্তি ঘটবে, জীবনে সম্মান প্রাপ্তি ঘটবে, বিপদ যতই হোক তা কাটিয়ে উঠবে। জাতক সরকারি বা আধা সরকারি দপ্তর থেকে উপার্জন করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে ছোটোখাটো অশান্তি হতে পারে। সন্তানের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা থাকবে। নিজের শারীরিক অসুস্থতা আসতে পারে। তবে তার মধ্যে শিক্ষার সাফল্য। প্রতিবেশীর থেকে সমস্যা হতে পারে।

মীন : নিজ প্রচেষ্টায় কর্মে উন্নতি। তবে অত্যধিক ব্যয়ের কারণে আর্থিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। এবং উত্তরাধিকার ব্যাপারে আশাভঙ্গ হতে পারে। জাতকের শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভোগান্তি হতে পারে। কর্মে বহু বাধার মধ্য দিয়ে উন্নতি হবে। □